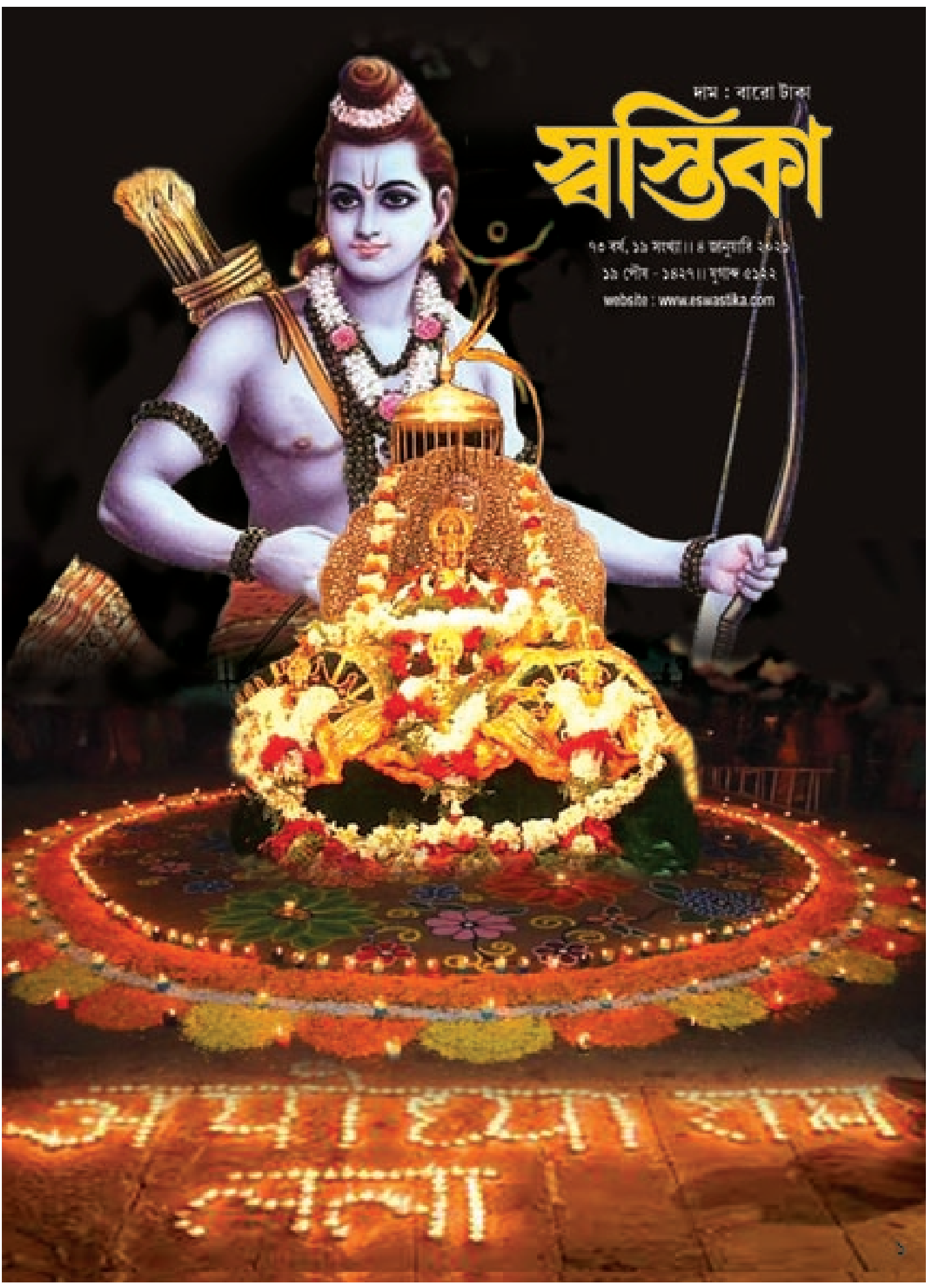
দাম : বারো টাকা
স্বস্তিকা
৭৫ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা ।। ৪ জানুয়ারি ২০২৩
১৯ পৌষ - ১৪২৯ ।। যুগাব্দ ৫১২৪
website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৩ বর্ষ ১৯ সংখ্যা, ১৯ পৌষ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

৪ জানুয়ারি - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

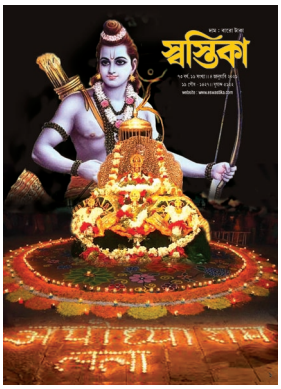

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

রামমন্দির চিরকালীন ভারতীয় আদর্শের প্রতীক
▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ৭

প্রধানমন্ত্রী রামমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে কোনো অসাংবিধানিক কাজ করেননি ▯ পুলকনারায়ণ ধর ▯ ৯

শ্রীরামজন্মভূমি মন্দিরের পুনর্নির্মাণ রাষ্ট্রীয় স্বাভিমানের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ▯ করুণা প্রকাশ ▯ ১৩

রামমন্দিরের ভূমিপূজা বিরোধী রাজনীতিতে শেষ পেরেক পুঁতে দিল ▯ মণীন্দ্রনাথ সাহা ▯ ১৭

ভারতবর্ষে রামচন্দ্রের বিকাশ ও নবনির্মাণ
▯ ড: অচিন্ত্য বিশ্বাস ▯ ২০

রামজন্মভূমি অযোধ্যা ছিল সর্বোৎকৃষ্ট মহানগরী
▯ দুর্গাপদ ঘোষ ▯ ২৩

অযোধ্যার রামমন্দির হয়ে উঠুক আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রমন্দির
▯ গৌতম কুমার মণ্ডল ▯ ২৬

রামমন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা জাতীয় অস্মিতার পুনর্জাগরণ
▯ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ▯ ৩০

রামমন্দিরের শিলান্যাস ভারতীয় নবজাগরণের সূচনারই প্রকাশ
▯ ড: তুষার কান্তি ঘোষ ▯ ৩৩

বনবাসী ভারতের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন
▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ৩৭

সাক্ষাৎকার : রামমন্দির পুনর্নির্মাণের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই — চম্পত রাই▯ ৪০

রামজন্মভূমি মন্দির হোক বিশ্বের বিস্ময়
▯ ডা: শচীন্দ্রনাথ সিংহ ▯ ৪৪

ইতিহাসবোধের জাগরণে রামমন্দির পুনর্নির্মাণ শক্তিশালী পদক্ষেপ▯ অনিমেষ বাগচী ▯ ৪৬

সেবাকাজ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পরম্পরা
▯ বিনয় বর্মণ ▯ ৪৮

CHOOSE THE BEST

DURO™

LIFETIME GUARANTEE FROM INSECT INFESTATION

TRIPLE HEAT TREATED

DOUBLE CALIBRATED TECHNOLOGY

MADE FROM MATURE AND SUSTAINABLE RAW MATERIAL

LOW EMISSION CONFORMING TO E1 GRADE

The Forest Friendly Company

Duroply Industries Limited

BLOCK BOARD • PLYWOOD • VENEERS • DOORS

113 Park Street, North Block, 4th Floor, Kolkata 700016 | **P:** (033) 2265 2274 | **Toll Free:** 1800 345 3876 (DURO)

Email: corp@duroply.com | **Website:** www.duroply.in | **Find us on** duroplyindia

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রামমন্দির প্রতিষ্ঠাতেই হিন্দুত্ব আন্দোলন শেষ হইল না

হিন্দুদের পাঁচশত বৎসরের সংগ্রাম একটি পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এই বৎসর আগস্ট মাসের পাঁচ তারিখে। এই দিনটিতে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রামমন্দিরের ভূমিপূজন করিয়াছেন। তাহার মাধ্যমে অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের শুভ সূচনা হইয়াছে। এই দিনটি ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখা রহিবে। বৈদেশিক আগ্রাসনের নির্মম নিদর্শনকে সরাইয়া ভারতীয় ঐতিহ্য ও পরম্পরার পুনরুদ্ধার এই দিনটিতে করা হইয়াছিল— এই কথা প্রতিটি দেশপ্রেমিক ভারতবাসী চিরকাল মনে রাখিবে। অযোধ্যায় যে ভব্য রামমন্দির গড়িয়া উঠিবে, তাহাকে কেবল হিন্দুদের পূজার্চনার স্থানরূপে দেখিলে ভুল হইবে। অযোধ্যার রামমন্দিরকে শুধু হিন্দুদের পূজার্চনার স্থান বলিলে শ্রীরামচন্দ্র ও রামমন্দিরের যে ব্যাপকতা তাহাকে ক্ষুণ্ণ করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রামায়ণকে নিছক একখানি কাব্যগ্রন্থ মনে করেন নাই। তাঁহার মতে, রামায়ণ ভারতবর্ষের ইতিহাস। ইহা নিছক একটি সময় বিশেষের ইতিহাস নহে। ইহা চিরকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাস। এই ইতিহাসে ভিতর ভারতীয় সমাজের আদর্শ ও পরম্পরা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীরাম চরিত্রের মাধ্যমেই এই আদর্শ চরিত্র বর্ণনা করা হইয়াছে। কাজেই রামচন্দ্রকে ভারতীয় আদর্শ ও পরম্পরার প্রতীক হিসাবেই দেখিতে হইবে। কোনো বিশেষ ধর্মবলম্বীদের জন্য নহে, অযোধ্যায় রামমন্দির প্রতিটি ভারতবাসীর আদর্শের প্রতি প্রণত হইবার স্থান।

রামমন্দিরের ভূমিপূজনের সঙ্গে সঙ্গেই অনেকে মনে করিতেছেন, হিন্দুত্ব আন্দোলনের বুঝি পরিসমাপ্তি ঘটিল। মনে রাখিতে হইবে, অযোধ্যায় রামমন্দির প্রতিষ্টা হিন্দুত্ব আন্দোনের অন্যতম লক্ষ্য হইতে পারে, কিন্তু একমাত্র লক্ষ্য নহে। হিন্দুত্ব আন্দোলন চিরপ্রবহমান একটি আন্দোলন। হিন্দুত্ব আন্দোলনের এখনো অনেক পথ চলা বাকি। অযোধ্যায় রামমন্দির প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করা গিয়াছে বটে, কিন্তু কাশী-মথুরায় এখনো বিদেশি আগ্রাসনের কলঙ্কিত নিদর্শন রহিয়াছে। এই রাজ্যের মালদহেই এখনো আদিনাথ মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার স্থলে যে আদিনা মসজিদ গড়িয়া তোলা হইয়াছে, তাহা এখনো বিদ্যমান। কাশী-মথুরা বা আদিনাথ মন্দির পুনরুদ্ধার যতদিন না করা যাইতেছে, ততদিন হিন্দুত্ব আন্দোলন পূর্ণতা লাভ করিবে না। হিন্দুত্ব আন্দোলনের আরও দাবি —দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইন চালু করা। যতক্ষণ দেশে এই আইনগুলি চালু করা না যাইতেছে, ততক্ষণ হিন্দুত্ব আন্দোলনের বিরাম নাই। কাজেই, রামমন্দির স্থাপনার মধ্য দিয়াই হিন্দুত্ব আন্দোলন পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে এমন ভাবিয়া উল্লসিত হইবার কোনো কারণ নাই।

তবে, এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে, অযোধ্যায় রামমন্দির পুনর্নির্মাণ হিন্দু অস্মিতার পুনর্জাগরণ ঘটাইয়াছে। হিন্দুদের মধ্যে যে ব্রহ্মের শক্তি লুক্কায়িত ছিল, তাহাকে জাগ্রত করিয়াছে। ভারতের ঐতিহ্য ও আদর্শকে সদম্ভে বিশ্বের দরবারে পুনরায় উপস্থাপিত করিয়াছে। অযোধ্যায় রামমন্দির চিরকাল হিন্দুদের এই বল ও বীর্যের প্রতীকস্বরূপই বিরাজ করিবে।

সুভাষিতম্

জনিতা চোপনেতা চ যস্তু বিদ্যাং প্রযচ্ছতি।

অন্নদাতা ভয়ত্রাতা পঞ্চৈতা পিতরঃ স্মৃতাঃ।। (চাণক্য নীতি)

জন্মদাতা, উপনয়ন সংস্কার দাতা, বিদ্যাদাতা, অন্নদাতা এবং ভয়ত্রাতা—এই পাঁচজনকে পিতা বলা হয়।

पतंजलि®
प्रकृति का आशीर्वाद

करोड़ों देशवासियों का भरोसेमन्द हर्बल टूथपेस्ट

दन्त कान्ति

दन्त कान्ति के लाभ

✓ लौंग, बबूल, नीम, अकरकरा, तोमर, बकुल आदि बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित दन्त कान्ति, ताकि आपके दाँतों को मिले लंबी उम्र व असरदार प्राकृतिक सुरक्षा।

✓ पायरिया, मसूड़ों की सूजन, दर्द व खून आना, सेंसिटिविटी, दुर्गन्ध एवं दाँतों के पीलेपन आदि को दूर करे।

✓ कीटाणुओं से लम्बे समय तक बचाकर दे दाँतों को प्राकृतिक सुरक्षा कवच।

पूरी दुनिया अब नैचुरल प्रोडक्ट्स को अपना रही है
आप भी पतंजलि के नैचुरल प्रोडक्ट्स अपनाइए और प्रकृति का आशीर्वाद पाइए

आवाहन– राष्ट्र के जागरुक व्यापारियों व ग्राहकों से हम विनम्र आवाहन करते हैं कि करोड़ों देश भक्त भारतीयों की तरह, आप भी पतंजलि के उत्पादों को अपनी दुकानों व दिलों में सर्वोच्च प्राथमिकता देकर जन–जन तक पहुँचाएं और देश की सेवा व समृद्धि में योगदान दें। जिससे महात्मा गाँधी, भगत सिंह व राम प्रसाद बिस्मिल आदि सभी महापुरुषों के स्वदेशी अपनाने के सपने को मिलकर साकार कर सकें।

पढ़ेगा हर बच्चा
बनेगा स्वस्थ और सच्चा
दन्त कान्ति का पूरा प्रॉफिट एजुकेशनल चैरिटी के लिए समर्पित है

पतंजलि आयुर्वेद के लगभग 500 उत्पाद है, ये शुद्ध खाद्य उत्पाद व हर्बल सौन्दर्य उत्पाद हमारे पतंजलि स्टोर्स के साथ ओपन मार्केट की दुकानों पर भी उपलब्ध है।

রামমন্দির চিরকালীন ভারতীয় আদর্শের প্রতীক

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

রামায়ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের সমালোচকদের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি মহার্ঘ্য কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন—"স্তব্ধ হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতে হইবে সমস্ত ভারতবর্ষ অনেক সহস্র বৎসর ইহাদিগকে কীরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছে। আমি যত বড়ো সমালোচকই হই না কেন, একটি সমগ্র প্রাচীন দেশের ইতিহাস প্রবাহিত সমস্ত কাজের বিচারের নিকট যদি আমার শির নত না হয়, তবে সেই ঔদ্ধত্য লজ্জারই বিষয়।" রামায়ণ এবং রামচন্দ্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে অপরিসীম শ্রদ্ধা, এই বাক্যে তাই পরিস্ফুট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ রামায়ণকে নিছক একটি এপিক হিসেবে দেখতে চাননি কখনো। বরং রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন, এপিক হিসেবে দেখলে রামায়ণের যে ব্যক্তি তাকেই খর্ব করা হয়। যে কারণে বলছেন, 'আধুনিক কোনো কাব্যের মধ্যেই এমন ব্যাপকতা দেখা যায় না। মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট-এর ভাষার গাম্ভীর্য, ছন্দের মাহাত্ম্য, রসের গভীরতা যতই থাক না কেন, তথাপি তাহা দেশের ধন নহে— তাহা লাইব্রেরির আদরের সামগ্রী।' রামায়ণকে কিন্তু লাইব্রেরির সামগ্রী নয়, দেশের ধন হিসেবে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের কাছে রামায়ণ এক ইতিহাস। এই ইতিহাস কোনো সময় বিশেষের ঘটনাবলীর ইতিহাস নয়। অন্য ইতিহাস কালে কালে কত পরিবর্তন হয়েছে— এ ইতিহাসের কোনো পরিবর্তন হয়নি। এ ইতিহাস চিরকালীন এবং শাশ্বত। কেন? রবীন্দ্রনাথ বলছেন— 'ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প, তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যরহস্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।' বলেছেন, 'মানুষেরই চরম আদর্শ স্থাপনের জন্য ভারতের কবি মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন এবং সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত মানুষের এই আদর্শরচিত বর্ণনা ভারতের পাঠকমণ্ডলী পরমাগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া আসিতেছেন।'

রামায়ণ ভারতের চিরকালীন আদর্শবোধের বর্ণনা করেছে। এবং শ্রীরামচরিত্রের মাধ্যমে এই আদর্শের শিক্ষা দিয়েছে। চিরকালীন আদর্শবোধের কথা বলেছে বলেই রামায়ণ সময় বিশেষের নয়, বরং কালোত্তীর্ণ হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রও মর্যাদাপুরুষোত্তমের আসনে আসীন হয়েছেন এই চিরকালীন শাশ্বত আদর্শবোধকে নিজের জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট করতে পেরেছেন বলেই। শ্রীরামচরিত্র ও রামায়ণ থেকে কী শিক্ষা পেয়েছি আমরা? যদি রামায়ণ কেউ ভালোভাবে অনুধাবন করে থাকেন তো দেখবেন, এক নয়, রামায়ণ ও তার প্রধান চরিত্র আমাদের একাধিক শিক্ষা দিয়েছেন। শ্রীরামচন্দ্র সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষাটি দিয়েছেন, তা হলো জাতীয়তাবোধ। দেশমাতৃকার প্রতি সম্মান এবং ভালোবাসা। অরণ্যে রাক্ষসদের উৎপাত বন্ধ করতে

এবং তাদের দমন করতে কিশোর রাম ও লক্ষ্মণকে ঋষি বিশ্বামিত্র রাজা দশরথের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু সে কি শুধুই রাক্ষসবধের জন্য? তা তো নয়। রামায়ণ পাঠে আমরা দেখতে পাই, এই দেশের সঙ্গে, দেশের ইতিহাসের সঙ্গে, অধিবাসীদের সঙ্গে, সমাজ জীবনের সঙ্গে, রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণকে পরিচয় করিয়ে দেওয়াও উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বামিত্রের। বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণ চলেছেন অরণ্যে। এই যাত্রাপথে বিশ্বামিত্র একের পর এক রাজ্য চেনাচ্ছেন রামকে। সেইসব রাজ্যের ঐতিহ্য, সমাজজীবন, প্রাকৃতিক গড়ন, শস্য, রাষ্ট্রনীতি— সবই উঠে আসছে বিশ্বামিত্রের বর্ণনায়। মুগ্ধ শ্রোতা রাম চিনে নিচ্ছেন এই সুবিশাল ভারতবর্ষকে। তার ফলশ্রুতি কী? লঙ্কা বিজয়ের পর যখন স্বর্ণলঙ্কার রূপে মুগ্ধ লক্ষ্মণ সেখানেই থেকে যেতে চাইছেন, তখনই রামচন্দ্র তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন— 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরিয়সী।' জাতীয়তাবোধের এই মহান বাণী ভারতবর্ষ কেন, আর কোনো দেশের কাব্যেই ধ্বনিত হয়নি।

রামায়ণ সেই অখণ্ড অমৃতপিপাসুদেরই চিরপরিচয় বহন করিতেছে। ইহাতে যে সৌভ্রাত্র, যে সত্যপরায়ণতা, যে পাতিব্রত্য, যে প্রভুভক্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রতি যদি সরল শ্রদ্ধা ও অন্তরের ভক্তি রক্ষা করিতে পারি, তবে আমাদের কারখানা ঘরের বাতায়ন মধ্যে মহাসমুদ্রের নির্মল বায়ু প্রবেশের পথ পাইবে।

রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্র চরিত্রের ভিতর দিয়েই আমরা প্রজাকল্পে নিজের সুখ এবং আনন্দ বিসর্জন দেওয়া এক নৃপতিকে খুঁজে পাই। রামচন্দ্র নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে, কঠিন জীবনযাপন করে, স্ত্রী বিচ্ছেদ সহ্য করে, অশুভকে বিনাশ করে ফিরেছেন অযোধ্যায়। তখন প্রজাপালন তার কাছে মুখ্য কর্তব্য। এই পর্বে অযোধ্যায় তাঁর প্রজারা যখন সীতাদেবী সম্পর্কে সন্দিহান হচ্ছেন, তখন প্রজাকল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রাখতে গিয়ে নিজের সুখ এবং আনন্দকে বিসর্জন দিয়ে স্ত্রী সীতাকে আবার ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন নৃপতি রামচন্দ্র। রামচন্দ্র একজন পরাক্রমশালী নৃপতি হিসেবে প্রজাদের মনোভাবকে গুরুত্ব না দিতেই পারতেন। অবজ্ঞা করতে পারতেন অযোধ্যার প্রজাদের দাবি। কিন্তু তাতে অযোধ্যায় প্রজা বিদ্রোহ হতো। বিনষ্ট হতো অযোধ্যায় সুখ-শান্তি। শ্রীরামচন্দ্রের কাছে তাই নিজ সুখ এবং আনন্দের থেকেও বড়ো হয়েছিল প্রজার কল্প। ভগবান বুদ্ধ আত্মমুক্তি কল্পে স্বীয় স্ত্রীকে ত্যাগ করেছিলেন। রামচন্দ্র স্ত্রীকে ত্যাগ করেছিলেন প্রজাকল্পে। রামায়ণের দৃঢ় সমালোচকরা এটি বুঝতে চান না। কিন্তু নিজের স্ত্রীর প্রতি কি রামচন্দ্রের ভালোবাসা কমে গিয়েছিল কোথাও? একেবারেই না। প্রজাকল্পে স্ত্রীকে ত্যাগ করে মনোকষ্টে দিন কাটিয়েছেন রাজা রাম। সীতার অনুপস্থিতিতে স্বর্ণ সীতামূর্তি প্রতিষ্ঠা করে রাজ্য শাসন করেছেন। সীতার পাতাল প্রবেশের পর সরযূ নদীর জলে আত্মবিসর্জন দিয়েছেন। এক্ষেত্রে রামচন্দ্র এবং তাঁর তিন ভ্রাতার চরিত্রের একটি বিশেষ দিকের প্রতিও দৃষ্টি দিতে হবে। প্রাচীন ভারতে বহু বলবীর্যশালী নৃপতিরই বহুবিবাহ ছিল। বহুগামিতায় অভ্যস্ত ছিলেন তাঁরা। স্বয়ং রাজা দশরথেরও তিনজন স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র এবং তাঁর তিন ভ্রাতা কারোরই বহুবিবাহ ছিল না। কেউই বহুগামিতায় অভ্যস্তও ছিলেন না। রামায়ণের মাধ্যমে শ্রীরামচন্দ্র চরিত্র বৃহত্তর ভারতীয় সমাজগঠনের শিক্ষাটিও দিয়ে গেছেন। বনবাসকালে রামচন্দ্র বনবাসী-গিরিবাসী-মূলনিবাসীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে একাত্ম হচ্ছেন। ভালোবাসা দিয়ে তাদের হৃদয় জয় করেছেন। আশ্রয় গ্রহণ করছেন অরণ্যবাসী রাজা গুহকের, শবরীকে ভালোবাসা উজাড় করে দিচ্ছেন, আবার লঙ্কা অভিযানে তার সঙ্গী হচ্ছেন বনবাসী-গিরিবাসী মূলনিবাসীর। মনে রাখতে হবে, কোনো রাজানুগ্রহ দিয়ে নয়। রামচন্দ্র এদের হৃদয় জয় করছেন ভালোবাসা দিচ্ছেন। উত্তর থেকে দক্ষিণ সমগ্র ভারতকে একসূত্রে গ্রথিত করছেন।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— 'রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়েছে। পিতা-পুত্রে, ভ্রাতায়-ভ্রাতায়, স্বামী-স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতি ভক্তির সম্মান, রামায়ণ তাহাই এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে।' প্রাচীন ভারতীয় সমাজে গার্হস্থ্য আশ্রম অতি উচ্চস্থান অধিকার করেছিল। প্রাচীন ভারতের গার্হস্থ্যাশ্রম অতি উচ্চ স্থান অধিকার করেছিল। প্রাচীন ভারতের গার্হস্থাশ্রমের শিক্ষা দেওয়া হতো। তা কখনই ব্যক্তিগত সুখ ও সুবিধার লক্ষ্যে ছিল না। বরং সমষ্টির সুখ, সমষ্টির কল্যাণ, সমষ্টির সমৃদ্ধি শিক্ষাই সেই গার্হস্থাশ্রমের শিক্ষা ছিল। রামায়ণ সেই আদর্শ গার্হস্থাশ্রমের শিক্ষাই দিয়েছে আমাদের। পিতৃসত্য রক্ষার্থে রামচন্দ্র বনবাসে গিয়েছিলেন। পিতার প্রতিশ্রুতি পুত্রকে রক্ষা করতে হবে কেন— এমন প্রশ্ন তুলে তিনি অযোধ্যার সিংহাসন দখল করেননি। বরং নিঃশর্তভাবে পিতার প্রতি আনুগত্য পালনে এগিয়ে এসেছিলেন। ভ্রাতৃপ্রেমের নিদর্শনও আমরা পাই রামায়ণে। কৈকেয়ী চেয়েছিলেন, রাম বনবাসে গেলে ভরত অযোধ্যার রাজ্যপাটে বসুন। সে সুযোগ ভরতের সামনে ছিলও। তবু ভরত সেই সুযোগ গ্রহণ করেননি। বরং রামচন্দ্র লঙ্কা বিজয় করে ফিরে আসা পর্যন্ত নন্দীগ্রামে রামের পাদুকা সিংহাসনে রেখে রাজ্য পরিচালনা করেছেন ভরত। তেমনই লক্ষ্মণ। রামের অনুগত হয়ে চোদ্দ বছরের অনিশ্চিত বনবাসের জীবন বেছে নেওয়ার কোনো প্রয়োজনই ছিল না তাঁর। তবু নিয়েছিলেন। এবং তা নিছক ভ্রাতৃপ্রেমেরই টানে। এই বনবাসের দিনগুলিতে রামচন্দ্রও কিন্তু পিতার স্নেহে আগলে রেখেছিলেন ভ্রাতা লক্ষ্মণকে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'রামায়ণ সেই অখণ্ড অমৃতপিপাসুদেরই চিরপরিচয় বহন করিতেছে। ইহাতে যে সৌভ্রাত্র, যে সত্যপরায়ণতা, যে পাতিব্রত্য, যে প্রভুভক্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রতি যদি সরল শ্রদ্ধা ও অন্তরের ভক্তি রক্ষা করিতে পারি, তবে আমাদের কারখানা ঘরের বাতায়ন মধ্যে মহাসমুদ্রের নির্মল বায়ু প্রবেশের পথ পাইবে।' রামায়ণে বর্ণিত এই চিরকালীন আদর্শেরই প্রতীক শ্রীরামচন্দ্র। অযোধ্যায় যে রামমন্দির নির্মাণ শুরু হয়েছে, সেই মন্দির নিছক উপাসনাস্থল নয়। সেই রামমন্দির চিরকালীন ভারতীয় আদর্শের প্রতীক।

অযোধ্যায় রামমন্দিরের ভূমিপূজন অনুষ্ঠানে (৫ আগস্ট) বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রধানমন্ত্রী রামমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে কোনো অসাংবিধানিক কাজ করেননি

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ভারতের সংবিধানের সর্বনাশ ঘটিয়েছেন এমন অভিযোগ আজ কেন করছেন? এরা কোনোকালেই ধর্ম কী সে সম্বন্ধে জানতে বা মানতে চাননি। বাস্তবে এরা সংবিধান নয়, অধর্মেরই রক্ষাকবচ। ১৩৫ কোটি ভারতবাসীর এরা কতটুকু অংশ?

পুলকনারায়ণ ধর

গত ৫ আগস্ট ভারতের ইতিহাসে একটি বিরাট ঘটনা ঘটে গেছে। অযোধ্যার রামজন্মভূমিতে রামমন্দির নির্মণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে। এটি হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত দিয়ে। করোনা অতিমারীর আবহে খুব অল্পসংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে কাল ও ক্ষণ বিচার করে শাস্ত্রবিশারদদের নির্দেশ মেনে প্রধানমন্ত্রী রামমন্দিরের শিলা স্থাপন করেছেন। এই ঘটনাটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এরও একটি পূর্বঘটনা আছে। ভারতের মাহামান্য সর্বোচ্চ আদালত ৫ জন বিচারপতি নিয়ে বেঞ্চ গঠন করে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি-সহ ৫ বিচারক সর্বসম্মত ভাবে রায় ঘোষণা করেন যে রামজন্মভূমির জমির অধিকার বর্তাবে রামজন্মভূমি ন্যাসের ওপর। এবং একটি 'ট্রাস্ট' গঠন করা হবে মন্দির নির্মাণের উদ্দেশ্যে। এই ট্রাস্ট গঠিত হবে ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে। সুন্নি মুসলমানদের জন্যও এর বাইরে জমি প্রদান করা হবে।

সুপ্রিম কোর্টের রায় দানকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে ও মুসলমান বিরুদ্ধাবাদীদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু কোনো কিছুই ধোপে টেকেনি। ১৯৪৯ সাল থেকে যে বিতর্কের সূচনা

অযোধ্যায় রামমন্দিরের ভূমিপূজন অনুষ্ঠানে (৫ আগস্ট) গিয়ে রামলালার সামনে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

হয়েছিল এবং যা প্রাক্তনমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সময়ে (১৯৮৫) একটা ভোটকেন্দ্রিক কৌশলীমাত্রা লাভ করেছিল যা বহু দশক ধরে কোনো আদালতই নিষ্পত্তি করতে পারেনি। বলা সঙ্গত কোনো আদালতই (এমনকী সুপ্রিম কোর্টও) তার সাহসিক সমাধানে শব্দ উচ্চারণ করেনি। শেষ পর্যন্ত ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব সমাজ ও নানা দলিল দস্তাবেজ ও আইনের চুলচেরা বিচার করে প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বে ৫ বিচারপতি সর্বসম্মত ভাবে সংবিধান সম্মত ধর্মনিরপেক্ষ রায় ঘোষণা করেছেন। আইনের বিচারে কোনো রায় কোনো ব্যক্তি বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর পক্ষে গেলেও তা মূলত নিরপেক্ষ বলেই গণ্য হবে। কোন গোষ্ঠী এতে আনন্দ অনুভব করবে তা আইনের বিচার্য বিষয় নয়। সত্য কঠিন। সুপ্রিম কোর্ট এই কঠিন সত্যকেই সহজে মেনে নিতে আজ্ঞা দিয়েছিল। প্রতিক্রিয়া যার যেমন। এই রায়েরই অনুবর্তী হিসেবে পরবর্তী বড়ো ঘটনা হলো মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

এক সময় প্রশ্ন উঠেছিল বাবরি মসজিদের নীচে অন্য কোনো ধাঁচা বা মন্দির আছে কিনা। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের পর সে প্রশ্ন মীমাংসিত হয়েছে। ধাঁচা ছিল। সে বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টও তা উল্লেখ করেছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর প্রশ্ন উঠল ওই অবিতর্কিত জমিতে মন্দির না করে কেন হাসপাতাল বা মিউজিয়াম তৈরি করা হবে না। সে দাবিও বুদবুদের মতো মিলিয়ে গেল। এরপর থেকে কোনো জরুরি প্রশ্ন আর ওঠেনি। কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনেরও অবকাশ নেই। রামের নামে মন্দির নির্মাণ হবেই এই অনিবার্যতা বিরুদ্ধবাদীরা বুঝতে পারলেন। যদিও তাঁরা মুসলমান নেতা আসাদুদ্দিন ওয়েসির (এআইএমইন) মতো আজও সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সমালোচনা করেন। সব পথ ও কৌশল রুদ্ধ হলে পর আজ হইচই করছেন 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র রণকৌশল নিয়ে যার তাৎপর্য বাস্তবে শূন্য। এদের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা ও একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জমি বিতর্কের কোনো মীমাংসা না ঘটতে দেওয়া। কারণ তাহলে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে এরা সদাসর্বদা গোলোযোগ সৃষ্টি করতে পারবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে যে-ভাবেই হোক ভারতের ভাবমূর্তিকে বিশ্বের দরবারে খাটো করতে হবে। ডাইনে বাঁয়ে সবসময় শুধু মোদী বিরোধিতা করে যেতে হবে। এই প্রচেষ্টারই অঙ্গ হিসেবে এখন প্রশ্ন তোলা হচ্ছে যে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন্দিরের শিলান্যাস করে সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা লঙ্ঘন করেছেন। যারা এ প্রশ্ন তুলছেন তারা যে সংবিধান বোঝেন না তা নয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে কমিউনিস্ট-নেহরু মার্কা বস্তাপচা ধারণা ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের মনে অহেতুক ভীতি সৃষ্টি করছেন। এ ভাবনাটি বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। আমরা দেখতে চাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শিলন্যাস করে ও রামলালার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে সংবিধান কীভাবে লঙ্ঘন করেছেন এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি

কলুষিত করেছেন।

প্রথমত, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি ও তাঁর সরকার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ও ফর্মূলা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। এ সম্বন্ধে বিরুদ্ধবাদীদের কিছু বলার নেই। যদি থাকত তবে তারা তা নিয়ে এই মুহূর্তেই সুপ্রিম কোর্টে দৌড়াতেন।

দ্বিতীয়ত, যে কোনো ভারতীয় নাগরিকই তার মৌলিক অধিকার চর্চা করতে ও দাবি করতে পারেন। এক্ষেত্রে সংবিধানের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (২৫ থেকে ২৮ নং ধারা) পালন করা আমার- আপনার মতো নরেন্দ্র মোদীরও আছে। ঘটনাক্রমে তিনি আজ দেশের প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলে সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার বর্জন করতে হবে এমন ধারা সংবিধান বা শপথ গ্রহণের ভূর্জপত্রে নেই। সুতরাং তিনি যেখানেই যাবেন প্রধানমন্ত্রীর তকমা তাঁর থাকবেই। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বত্রই তাঁর উপস্থিতি হিসেবেই গণ্য হবে। মন্দির বা হাসপাতাল পরিদর্শনে গেলেও প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীই থাকবেন। ভারতের সংবিধানের কোনো ধারার সঙ্গে এ বিষয়ে কোনো বিরোধ নেই।

তৃতীয়ত, নরেন্দ্র মোদী বিজেপি দলের পক্ষ থেকে নির্বাচনে জয়ী হয়ে প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হয়েছেন। এই বিজেপি দলের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে রামমন্দির নির্মাণের প্রতিশ্রুতি লিপিবদ্ধ আছে। এই প্রতিশ্রুতি কারুর পছন্দ হতে পারে আবার কারুর অপছন্দ হতে পারে। কিন্তু তা নির্বাচন বিধি বা সংবিধান ভঙ্গ করে না। বিজেপির মতে তারা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে, মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার বাতুলতায় নয়। এটা তর্কের বিষয়। কিন্তু তা যদি সংবিধান বিরুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয় তবে তারা নির্বাচনী বিধিভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত হতো। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ভিত্তিতে তাঁর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করলে ধর্মনিরপেক্ষতার কীভাবে সর্বনাশ ঘটল তার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্য নেই। রাজনৈতিক বাগবিস্তার ছাড়া এর কোনো মূল্য নেই।

এ প্রসঙ্গে ইতিহাসের একটি পুরানো ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে। ঘটনাটি হচ্ছে— গুজরাটের প্রাচীন সোমনাথ মন্দির প্রসঙ্গ। তুর্কি মুসলমান শাসক মহম্মদ গজনি সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করে বহু কোটি মূল্যের সম্পদ লুণ্ঠন করেছিল। জোতির্লিঙ্গ বিনষ্ট করে হিন্দুমানসে চিরস্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। একবার নয় বহুবার এই মন্দিরের ওপর আক্রমণ ঘটেছে। দেশ স্বাধীন হবার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের উদ্যোগে সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হয়। মন্দির উদ্বোধনে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদকে আহ্বান করা হয়। প্রধানমন্ত্রী নেহরু মন্দির পুনর্নির্মাণের কার্যে বরাবরই সরকারের মন্ত্রী-আমলা ও রাষ্ট্রপতিকে যুক্ত থাকায় আপত্তি জানিয়ে এসেছেন। ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ ২ মার্চ, ১৯৫১ সালে একটি চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে লেখেন যে, মন্দির উদ্বোধনে অংশগ্রহণ করাকে তিনি আপত্তিকর মনে করেন না। তিনি এই অনুষ্ঠানে অবশ্যই যাবেন। প্রধানমন্ত্রী নেহরু প্রত্যেক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের চিঠি দিয়ে এই অনুষ্ঠানে যোগ না দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ অবিচল চিত্তে মন্দিরের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে নেহরুর বিরোধিতা করে বলেছিলেন যে তিনি ভারতের কোনো ঐতিহ্যকে লঙ্ঘন করেননি। মনে রাখতে হবে সে সময় ভারতের সংবিধানে 'সেকুলার' শব্দটিই ছিল না। এই শব্দের স্থাপন ১৯৭৬ সালে ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালে। যাইহোক, মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে, এর পরেও ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ আরও বহু বছর (১৯৬২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) রাষ্ট্রপতির পদে ছিলেন এবং ভারতও 'সেকুলার' ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে নরেন্দ্র মোদীর রামমন্দিরের শিলান্যাস কোনো কোনো বুদ্ধিজীবীর অনুমোদন না পেলেও তা 'সেকুলার' সংবিধানের কোন ধারাকে লঙ্ঘন করেছে তার কোনো উত্তর তাদের জানা নেই। কিছুদিন আগেও বেলুড়মঠ রামকৃষ্ণ মিশনে প্রধানমন্ত্রী কেন রাত্রিবাস করেছিলেন সে সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলা হলো কয়েকটি অর্বাচীন প্রাক্তনীদের দ্বারা। আসলে 'সেকুলারইজম' বা রাষ্ট্রীয়তা নয়, মোদী বিরোধিতার জন্যই

ফ :২

দেশ আজ রামময়। দেশ আজ রোমাঞ্চিত। বহুদিনের অপেক্ষার সমাপ্তি। তাঁবুতে বিরাজমান রামলালা এবার মন্দিরে প্রবেশ করবেন। অনেক উত্থান-পতনের পর আজ রামজন্মভূমি মুক্ত। ১৫ আগস্ট দেশ স্বাধীন হয়েছে, ৫ আগস্ট মুক্ত হলো রামমন্দির। রাম আমাদের মনের মধ্যে স্থাপিত। রামের অদ্ভুত শক্তি দেখুন, রামের অস্তিত্ব মিটিয়ে দেওয়ার অনেক চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু রাম আজও আমাদের মনে বাস করেন, তিনি আমাদের সংস্কৃতির ভিত্তি।

— প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

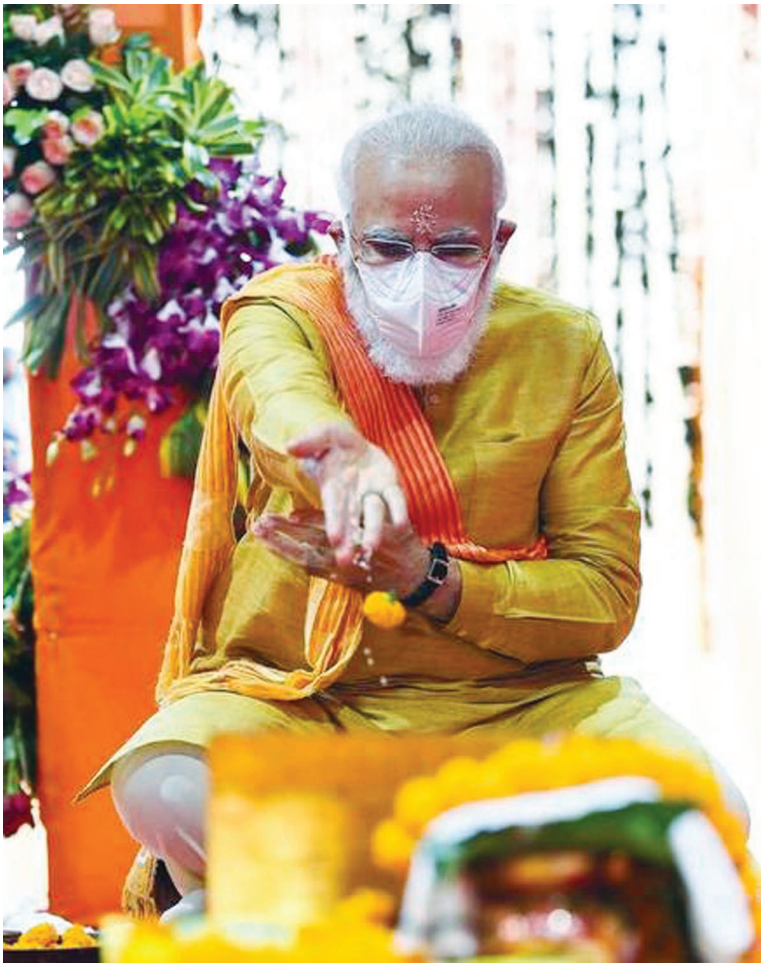

শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থলে ভূমিপূজন করছেন নরেন্দ্র মোদী।

সবকিছু ঘুলিয়ে দেওয়াই কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে কিছু রাজনৈতিক দলের এবং তাদের শাগরেদদের।

এই রাজনৈতিক প্রশ্ন ছেড়ে এবার আবার অন্য একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। ভারতের সংবিধান কতজন বুদ্ধিজীবী পড়েছেন বা অন্ততপক্ষে শুধু চোখে দেখেছেন তা বলা দুরূহ। কিন্তু তাঁদের কেউ কেউ নিশ্চয় জানেন যে মূল হস্তলিখিত সংবিধানে কিছু চিত্র আছে। এই চিত্রগুলিতে সনাতন ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, আদর্শ ও ভাবকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই চিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রাম-সীতা-লক্ষ্মণ, রথারূঢ় অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের চিত্র। আছে বীরভক্ত হনুমানের চিত্র। এই চিত্রগুলি অঙ্কন করেছেন নন্দলাল বসু ও বিশ্বভারতীর কতিপয় ছাত্র। ভারতের সংবিধান কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের নীতি গ্রহণ করেও 'সেকুলার' সংবিধানের মর্যাদা পেয়েছে। সুতরাং নিজের ধর্ম বিশ্বাস ও ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কখনই নেতিমূলক ফলের কারণ হতে পারে না। শুধু ভোটের তাগিদে মাথায় ঘোমটা ভাসুর-ভাদ্দর বউয়ের ভড়ং করা আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর। এটা তো আমাদের রাজ্যের নেতা-নেত্রীরাও বোঝেন। যখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে মা-দুর্গার আবরণ উন্মোচন করেন বা খুঁটি পুজোর অনুষ্ঠানে বিধায়ক, সাংসদ বা স্থানীয় পৌর প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকেন পুরোহিতদের সঙ্গে তখন কি ধর্মনিরপেক্ষতার ভাব দূষিত হয়? মাজার বা দরগায় মাথা ঠেকিয়ে কি ধর্মনিরপেক্ষতা ক্ষয়ে যায়? ইফতার পার্টিতে ঘুরে ঘুরে কোন ধর্মনিরপেতার পোষণ করা হয়? অথচ প্রধানমন্ত্রী রামমন্দিরের শিলান্যাস করবেন ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে এই দুশ্চিন্তায় যদি কারও শরীর ও মন বিবশ হয়ে যায় তবে তা সত্যিই চিন্তার বিষয়। কারণ এ ব্যাপারে তো আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার কোনো উপায় নেই। আমরা কি কেউ প্রশ্ন তুলেছিলাম যখন ধর্মনিরপেক্ষ (আদতে ধর্মহীন) জওহরলাল নেহরুর চিতাভস্ম (তাঁরই ইচ্ছায়) কীভাবে সদগতি প্রাপ্ত হয়েছিল? আমরা কি জানতে চেয়েছিলাম প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর গলায় কার আশীর্বাদী রুদ্রাক্ষের মালা শোভিত হতো? না। কারণ এসব অবন্তর ও অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন।

কারণ এতে ধর্মের হানি হয়নি। কিন্তু ভারতবাসীর গভীর ঐতিহ্যের ধারক বাহক রাম ও হনুমান (যাঁদের রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দও বন্দনা করেছেন)-কে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ভারতের সংবিধানের সর্বনাশ ঘটিয়েছেন এমন অভিযোগ আজ কেন করছেন। এরা কোনো কালেই ধর্ম কী সে সম্বন্ধে জানতে বা মানতে চাননি। বাস্তবে এরা সংবিধান নয়, অধর্মেরই রক্ষাকবচ। ১৩৫ কোটি ভারতবাসীর এরা কতটুকু অংশ? ■

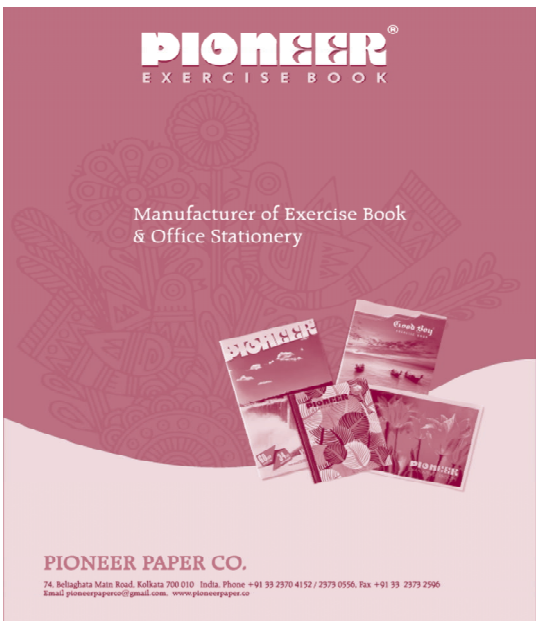

ভূমিপূজন স্থলে প্রণাম জানাচ্ছেন শ্রীমোদী।

শ্রীরামজন্মভূমি মন্দিরের পুনর্নির্মাণ রাষ্ট্রীয় স্বাভিমানের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

করুণা প্রকাশ

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যমে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।। —২/৩৬

যদি তুমি যুদ্ধে নিহত হও, তাহলে স্বর্গলাভ করবে আর যদি জয়লাভ করো তাহলে পৃথিবীর রাজত্ব ভোগ করবে। তাই হে অর্জুন! তুমি যুদ্ধের জন্য দৃঢ়নিশ্চয় হয়ে উত্থিত হও।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বৈদেশিক আক্রমণকারী গজনির দ্বারা ধ্বংস হওয়া সোমনাথ (দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ) মন্দিরের পুনর্নির্মাণ তৎকালীন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সংকল্প ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বের কারণে সম্ভব হয়েছিল। যদিও তাঁকে অনেক বিরোধিতার

সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর বিরোধিতা সর্দারজী তোয়াক্কা করেননি। রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ মন্দিরের উদ্ঘাটন করেন। তাঁকেও জওহরলাল নেহরুর বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় যাতে তিনি সোমনাথ মন্দির উদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে না যান। জানা যায়, মন্দির উদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতির পদও তিনি ছাড়তে প্রস্তুত ছিলেন। সোমনাথ মন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাভিমান পুনরুদ্ধারের অঙ্গ ছিল।

দীর্ঘ প্রায় ৫০০ বছর নিরন্তর সংঘর্ষের পর অযোধ্যায় শ্রীরাম জন্মভূমিতে হিন্দু সমাজ বিজয় লাভ করেছে। কেবল হিন্দু সমাজ নয়, কেবল ভারতবর্ষ নয়, সম্পূর্ণ বিশ্বের কাছে এটি একটি অভূতপূর্ব এবং বিস্ময়কর ঘটনা। কোনো রাষ্ট্র কোনো জাতি কতটা স্বাভিমানী হলে এটা সম্ভব হতে পারে।

শ্রীরামজন্মভূমি নিয়ে হিন্দু সমাজ যে লাগাতার সংঘর্ষ করে এসেছে, আপোশহীন লড়াই চালিয়েছে, বিশ্বে এরকম আর কোনো উদাহারণ নেই। রামজন্মভূমির জন্য কোনো প্রকার আপোশ বা সমঝোতা হিন্দু সমাজ কখনও করেনি। ভগবান শ্রীরামের প্রতি হিন্দুর আস্থা-শ্রদ্ধা আবহমানকাল ধরে ভারতীয় জীবনের অঙ্গ — 'সিয়া-রাম ময় সব জগ জানি, করহি প্রণাম জোরী যুগ পানী'। অনেক আক্রমণ, অনেক অত্যাচার যা বিশ্বের ইতিহাসে প্রায় বিরল বলা যায় তা সত্ত্বেও হিন্দুসমাজ তার আরাধ্য প্রভু শ্রীরামকে কখনও ভোলেনি। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর জন্মভূমির উপর বিধর্মীর আধিপত্য হিন্দু কখনও মেনে নেয়নি।

১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে বাবরের আদেশে তার সেনাপতি মীর বাকি যখন শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির ধ্বংস করে তখন অযোধ্যার আপামর হিন্দু সমাজ সর্বশক্তি দিয়ে তাঁদের আরাধ্য প্রভু শ্রীরামের মন্দির রক্ষার জন্য প্রাণপাত সংঘর্ষ করে। মুঘল আক্রমণকারীরা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান হওয়ার ফলে হিন্দু সমাজ অধিক সময় এই প্রতিরোধ বজায় রাখতে পারেনি। কিন্তু পরবর্তীকালে পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে জন্মভূমিকে মুক্ত করার জন্য সব ধরনের প্রচেষ্টা করেছে। অকথ্য অত্যাচার সহ্য করেছে, অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে, অনেক বলিদান দিয়ে জন্মভূমিকে উদ্ধারের চেষ্টা অনবরত চালিয়ে গেছে। কখনও হিন্দুরা জয়লাভ করেছে, কখনও আবার মুসলমান শাসকরা পুনরায় জন্মভূমিকে কবজা করেছে।

বছরের পর বছর, যুগ যুগ ধরে শ্রীরামজন্মভূমিকে মুক্ত করার জন্য হিন্দু রাজা-মহারাজা, ধর্মগুরু, সাধু-সন্ন্যাসীরা তথা দেশের আপামর রামভক্ত এই স্থানটির জন্য সর্বস্ব বলিদানের, পরাক্রমের, আত্মত্যাগের এক উদাহরণ প্রস্তুত করেছে। সেই সময়কার প্রায় সহায় সম্বলহীন হিন্দু সমাজ কীভাবে অত্যাচারী বর্বর মুসলমান শাসকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল তা আজ ইতিহাসকার, চিন্তক , বিদ্বান ও গবেষকদের কাছে এক বিস্ময়ের বিষয়। শত অত্যাচারেও হিন্দুর সেই চেতনা কখনও লুপ্ত হয়নি। যখন সুযোগ পেয়েছে তখনই স্বাভিমানী হিন্দু সমাজ তার হৃতগৌরব ফিরে পাওয়ার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে লড়াই করেছে।

ইসলামি শাসনের অবসানের পর ইংরেজ রাজত্ব শুরু হলে, তখনও জন্মভূমির বিষয়ে তাদেরও নীতির কোনো পরিবর্তন হয়নি। জন্মভূমিকে হিন্দুর হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। হিন্দু সমাজ কিন্তু থেমে থাকেনি। জন্মভূমিকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা দিন প্রতিদিন আরও তীব্র হয়েছে। কোনো এক সময়ে হিন্দু মুসলমান উভয়ই সহমত হলে কূটকৌশলী ইংরেজ তা বানচাল করে বিবাদ জিইয়ে রাখে। শুধু তাই নয়, যারা সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছিল এরকম উভয় পক্ষের কয়েকজনকে ইংরেজ শাসক ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, হিন্দুদের দ্বারা জন্মভূমিকে মুক্ত করার প্রচেষ্টায় ক্ষতিগ্রস্ত ধাঁচা মেরামতের সম্পূর্ণ খরচ ইংরেজ শাসক শাস্তিস্বরূপ হিন্দুদের নিকট হতে জবরদস্তি আদায় করে তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ধাঁচা মেরামত করেছে —এরকম প্রমাণও আছে।

তা সত্ত্বেও হিন্দু সমাজ চুপ করে বসে থাকেনি। ভারতের বিভিন্ন

শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থলে ভূমিপূজনে সকলের সঙ্গে শ্রীনরেন্দ্র মোদী।

বোতাম টিপে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থলে ভূমিপূজনের স্মারকশিলার আবরণ উন্মোচন করছেন নরেন্দ্র মোদী, যোগী আদিত্যনাথ, মহন্ত নিত্যগোপাল দাস। পাশে রয়েছেন মোহন ভাগবত।

প্রান্তে বাসকারী হিন্দু, বিভিন্ন ভাষাভাষী হিন্দু, পৃথক পৃথক গুরু পরম্পরা অনুসরণকারী হিন্দু, বনবাসী-শহরবাসী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, মহিলা-পুরুষ, কবি-সাহিত্যিক-লেখক-শিল্পী কোনো না কোনো সময়ে শ্রীরামজন্মভূমির বিষয়ে সোচ্চার হয়েছেন। হিন্দু যেমন কখনও রামকে ভোলেনি ঠিক সেই রকমই ভগবান শ্রীরামের জন্মস্থানকে মুক্ত করার কথা কখনও ভোলেনি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলে গেছে কিন্তু হিন্দুর ধমনীতে পুরুষানুক্রমে এই অন্যায়-অপমান- কলঙ্ক থেকে মুক্ত হওয়ার চেতনা সদা জাগ্রত থেকেছে। আমাদের দেশের সাধু-সন্ন্যাসীগণ, ধর্মগুরু, মনীষীগণ, রাষ্ট্রনায়কগণের বিশেষ ভূমিকা এ বিষয়ে কখনও অস্বীকার করা যাবে না। জাতির চেতনাকে সদা জাগ্রত (অলখ নিরঞ্জন) রাখার কাজ এই মহান বিভূতিরা করেছেন।

বিশ্বের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা কিছু ব্যতিক্রমী উদাহরণও দেখতে পাই। ইজরায়েল থেকে ইহুদিরা যখন বিধর্মীদের দ্বারা পরাভূত হয়ে তাদের নিজভূমি থেকে উৎখাত হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শরণার্থী রূপে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় তখন শত সমস্যার মধ্যেও তারা তাদের নিজ মাতৃভূমি ও ভাষা হিব্রুকে কখনও ভোলেনি। ইজরায়েলকে বিদেশিদের থেকে মুক্ত করার সংকল্প তারা কখনও ভোলেনি। দুনিয়ার যেখানেই তারা থেকেছে সেখান থেকেই তারা আগামী বছর জেরুজালম (ইজরায়েলের রাজধানী)-এ স্বাধীনতা দিবস পালন করার সংকল্প বার বার স্মরণ করেছে। আগামী বছরই তারা জেরুজালম উদ্ধার করতে পারেনি ঠিকই কিন্তু তাদের জাতির স্বাভিমানী চেতনা কখনও লুপ্ত হয়নি যে তাদের দেশ পরাধীন, তারা বিদেশিদের পদানত হয়ে আজ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে শরণার্থী রূপে অবস্থান করতে হচ্ছে। একটি জাতির সেই স্বাভিমানী মানসিকতা দৃঢ় সংকল্পের পরিণাম স্বরূপ আমরা জানি যে প্রায় ২০০০ বছর পর তারা ইজরায়েলকে স্বাধীন করতে সক্ষম হয়েছে। আজ তাদের প্রতিবেশী অনেক শক্তিশালী ইসলামি দেশ ইজায়েলের দিকে বাঁকা চোখে তাকাতে পারে না। ইজরায়েলের মানসিকতার সঙ্গে শ্রীরামজন্মভূমি উদ্ধারে সংকল্পবদ্ধ ভারতবাসীর মিল অনেকটাই।

আজ সবচেয়ে বড়ো আনন্দের বিষয় হলো, ভারতকে আত্মনির্ভর বানানোর জন্য যে আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন ছিল, যে স্বাভিমানের প্রয়োজন ছিল, তা আজ সগুণ, সাকার অধিষ্ঠান নির্মাণের শুভারম্ভ হচ্ছে। .... অযোধ্যায় ভব্য রামমন্দির নির্মাণ ভারতবর্ষে অন্য লক্ষ লক্ষ মন্দির নির্মাণের মতো কেবল একটি মন্দির নির্মাণ নয়, উপরন্তু দেশের সমস্ত মন্দিরে স্থাপিত মূর্তিগুলির যে তাৎপর্য, তার পুনঃপ্রকটীকরণ এবং তার পুনঃস্থাপন করার শুভারম্ভ আজ এখানে খুবই শক্তিশালী হাতের দ্বারা হলো।

— মোহনরাও ভাগবত,
সরসঙ্ঘচালক, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

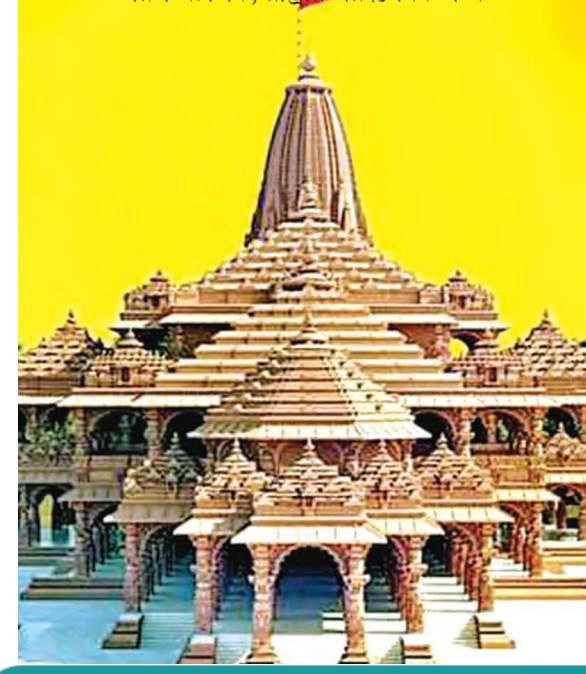

শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির কোনো সামান্য মন্দির নির্মাণের আন্দোলন ছিল না। এটি বাস্তবে রাষ্ট্রমন্দির নির্মাণের আন্দোলন। আমাদের দেশে রাম রাষ্ট্রের কল্পনা আছে। গান্ধীজীও রামরাজ্যের কথা বলেছেন। রামরাজ্য মানে এক আদর্শ রাষ্ট্র যেখানে সমস্ত নাগরিক ন্যায় পাবেন, এক সুশাসন সম্পন্ন এবং শান্তি-শৃঙ্খলা তথা শিক্ষা-সংস্কৃতি-সহ সর্বপ্রকারের উন্নতিসম্পন্ন এক রাষ্ট্র। এ সবকিছু তখনই সম্ভব হবে যখন কোনো জাতি কোনো রাষ্ট্র স্বাভিমানী হবে, আত্ম মর্যাদাসম্পন্ন হবে; নিজ মহাপুরুষ, নিজ ঐতিহ্য, পরম্পরা, সংস্কৃতির প্রতি গর্ববোধ করবে, শ্রদ্ধাবিন্দুগুলির ওপর পূর্ণ আস্থা থাকবে— আর এগুলির মূলে কিন্তু আধ্যাত্মিকতা। যুগ যুগ ধরে ভারতের হিন্দুরা সমাজ জীবনে ধর্মকে ধারণ করে চলেছে। তাই শত অত্যাচারেও হিন্দু নিজ সত্তা কখনও বিসর্জন দেয়নি।

বিদেশি আক্রমণকারী শাসকরা ভেবেছিল কিছু মন্দির ধ্বংস করে, ধর্মগ্রন্থ নষ্ট করে, তীর্থস্থান অপবিত্র করে, ধর্মান্তরিত করে, সর্বত্র এক ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ভারতকেও সম্পূর্ণ ইসলামিক দেশে পরিণত করা সম্ভব হবে। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি, কারণ ভারতের মূলে যে ধর্মচেতনা আর সেখান থেকে রাষ্ট্রচেতনা তা থেকে ভারত কখনও বিচ্যুত হয়নি। ঋষি অরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী রামতীর্থ প্রমুখ মনীষীর জীবনে ধর্মচেতনা ও রাষ্ট্রচেতনা সমার্থক ছিল। যেখানে মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামকে জীবনাদর্শ রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমাজকে পথ দেখিয়েছেন। যেখানে গীতা, রামায়ণ-মহাভারত জীবনের অঙ্গ সেখানে বিজয় নিশ্চিত।

১৫২৮-এ অযোধ্যায় রামজন্মভূমি পুনরুদ্ধারে যে সংঘর্ষ আমাদের পূবপুরুষেরা শুরু করেছিলেন তা কিন্তু একদিনের জন্যও থেমে থাকেনি। এ আন্দোলন শুধু অযোধ্যায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভারতের সর্বত্র সকল রাষ্ট্রভক্ত রামভক্তদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। রাম এখানে রাষ্ট্রনায়ক — রাজারাম; তিনি সকল হিন্দুর হৃদয়ের রাজা, তাঁকে মুছে ফেলা যায় না। গোস্বামী তুলসীদাসের জীবনের ঘটনার কথাও আমরা জানি যে, আকবর যখন দরবারে তাঁকে বাদশার সম্মানে নতমস্তক হতে বলে তখন তিনি প্রত্যাখান করে বলেন যে আমার তো রাজা শ্রীরাম। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রই হচ্ছেন একমাত্র রাজা, তিনি কেবল তাঁর সামনেই নতমস্তক হন। দুর্দণ্ডপ্রতাপ আকবর বাদশার ভ্রূকুটি কিন্তু তাঁকে নতমস্তক করাতে পারেনি। এই চেতনা, এই স্বাভিমানের কারণেই আজ ৫০০ বছর পর অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমিতে হিন্দুর বিজয় পতাকা উত্তোলিত হলো।

একটি স্বাভিমানী জাতি তার রাষ্ট্রীয় গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আনন্দে উদ্বেলিত। যাঁদের আত্মবলিদান, ত্যাগ, তপস্যায় এ বিজয় সম্ভব হলো জাতি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধাবনত। সমগ্র বিশ্ব এই বিজয় ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকল। ■

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থলে ভূমিপূজনে মন্ত্রপাঠ করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত।

রামমন্দিরের ভূমিপূজা বিরোধী রাজনীতিতে শেষ পেরেক পুঁতে দিল

সরকারি ক্ষমতা হাতে পেয়ে যাঁরা হিন্দুর সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিচ্ছেন তাঁরা যেন মনে রাখেন সমস্ত অশুভ শক্তির অবসান ঘটিয়ে এখানে একদিন রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা হবে।

মণীন্দ্রনাথ সাহা

প্রত্যাশা মতোই সমস্ত ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে নির্ধারিত দিন এবং সময়ে রামমন্দিরের ভূমিপুজো ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হলো। করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাই ৫ আগস্ট ২০২০ তারিখটি ভারতীয় ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। বাবরের আমলে শুরু হওয়া পরাধীনতার গ্লানি ঘুঁচিয়ে অগণিত সাধু-সন্ত ও রামভক্তদের ৫০০ বছরের লড়াইয়ের শেষে ভগবান শ্রীরামের মন্দির তৈরির সূচনা হলো। এর সঙ্গে শুরু হলো মহাকবি বাল্মীকি রচিত রামায়ণের রামের বিজয় যাত্রা।

আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুতে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রামের কৃত্তিবাস মুখোপাধ্যায় (ওঝা) ছিলেন মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একজন প্রধান কবি। আনুমানিক ১৪০৩ খ্রিস্টাব্দে বাল্মীকি রচিত সংস্কৃত রামায়ণের সহজবোধ্য বাংলা পদ্যানুবাদ করেছিলেন তিনি। সেই রামচন্দ্র সম্পর্কে পরবর্তীতে কে কী বলেছেন তা জানতে হলে আমাদের পিছন ফিরে দেখতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ মাদ্রাজে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'এই প্রাচীন বীরযুগের আদর্শপরায়ণতা ও নীতির সাকার মূর্তি — আদর্শ পতি, আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, সর্বোপরি আদর্শ রাজা রামচন্দ্রের চরিত্র অঙ্কন করিয়া মহর্ষি বাল্মীকি আমাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন।'

অত্যন্ত ছোটো বয়স থেকেই রামায়ণ ও ভগবান রামচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের জীবনে এবং কবিসত্তায় প্রভাব ফেলেছিল। তারই প্রমাণ আমরা পাই তাঁর কবিতার মাধ্যমে। 'বাবা যদি রামের মতো পাঠান আমায় বনে, যেতে আমি পারি নাকো তুমি ভাবছ মনে?/ কিন্তু আমি পারি যেতে ভয় করিনা তাতে/ লক্ষ্মণ ভাই

যদি আমার থাকত সাথে সাথে।' রামচন্দ্রের প্রভাব আরও পাওয়া যায় কবির 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে, 'ছেলেবেলা' প্রবন্ধে, 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে, গীতিনাট্য 'বাল্মীকি প্রতিভা' বা 'কালমৃগয়া' গ্রন্থে। রবীন্দ্র ভাবনায় সর্বত্র রামায়ণের ছাপ।

কাজি নজরুল ইসলামের একাধিক গানে-কবিতায় উঠে এসেছেন মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র। বিদ্রোহী কবির ভাষায়, 'অবতার শ্রীরামচন্দ্র, যে জানকিপতি/ তারও হলো বনবাস, রাবণ করে দুর্গতি।'

এস ওয়াজেদ আলির বিখ্যাত প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষ'। তাতে তিনি লিখেছেন— 'একজন যুবক মুদি দোকানের কাজের ফাঁকে ফাঁকে তার বৃদ্ধা মাকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠ করে শোনাচ্ছে, সেই যুবকের স্ত্রী তার কোলের ছেলেকে নিয়ে গৃহকার্যের মাঝে এসে পাশে বসে রামায়ণ শুনছে, আবার উঠে যাচ্ছে।' লেখক বহু বছর পর এসে দেখলেন অবিকল সেই দৃশ্য। সেই যুবক মুদি, বৃদ্ধা মা, ছেলে কোলে গৃহবধু আর সেই কৃত্তিবাসী রামায়ণের বইটি পাঠ করা হচ্ছে। লেখক প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। শেষে বুঝলেন, সেদিনের কোলের শিশু আজকের যুবক মুদি, সেদিনের তরুণী বধুই আজকের বৃদ্ধা, 'সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে।'

গান্ধীজী স্বয়ং রামরাজ্যের কথা বলেছেন। তিনি যে বিখ্যাত ভজনটি গাইতেন, তা হলো— 'রঘুপতি রাঘব রাজারাম, পতিত পাবন সীতারাম। সুন্দর বিগ্রহ মেঘশ্যাম, গঙ্গা তুলসী শালীগ্রাম। ভদ্র গিরিশ্বর সীতারাম, জগ-জনপ্রিয় সীতরাম। জানকী-রমণী সীতরাম, জয় জয় রাঘব সীতারাম।'

শ্রীরাম জন্মভূমি পরিসরে পারিজাত বৃক্ষ রোপণ করছেন শ্রীমোদী। সঙ্গে যোগী আদিত্যনাথ ও দীনেশচন্দ্র।

বর্তমানে বিজেপি বিরোধী রাজনীতিকদের মধ্যে ভয়ে হোক, ভক্তিতে হোক বা রাজনীতির আঙ্গিনায় টিকে থাকার লোভেই হোক রামের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। যেমন, ইতিপূর্বে সিপিএম নেতা সূর্যকান্ত মিশ্র মন্তব্য করেছিলেন, কেরলে আমরা রামগান শুরু করেছি এবং রামসপ্তাহ পালন করা হবে।

অযোধ্যায় রামমন্দিরের শিলান্যাসের আগের দিন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী (বঢড়া) বলেছেন— 'ভূমিপুজো জাতীয় ঐক্যের উৎসব হয়ে উঠুক। সরলতা, সাহস, সংযম, ত্যাগ এবং প্রতিজ্ঞা ছিল দীনবন্ধু রামের মূলকথা। ভগবান শ্রীরাম সবার সঙ্গে রয়েছেন। আশা করি এই ভূমি পুজো জাতীয় ঐক্য ও সংস্কৃতিকে আরও দৃঢ় করবে।'

মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা মধ্যপ্রদেশের বর্তমান কংগ্রেস সভাপতি কমলনাথ সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন— 'মন্দির তৈরির জন্য তারা অযোধ্যায় ১১টি রুপোর ইঁট পাঠাবেন। এছাড়াও সোমবার কংগ্রেসের অন্যান্য নেতা ও কর্মীদের নিয়ে তিনি ভোপালের বাড়িতে অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ উপলক্ষ্যে হনুমান চালিশা পাঠ করেছেন।'

অথচ এ রাজ্যে ইতিপূর্বে শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে যে কাণ্ড ঘটে গেছে তা স্মরণ করতে যেমন লজ্জায় মাথা হেট হয়ে আসে তেমনি ঘৃণা জন্মে। তা হলো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং গাড়ি থেকে নেমে তেড়ে যান শ্রীরামের নামে জয়ধ্বনি দেওয়া যুবকের দিকে। উপরন্তু রকের ভাষা ব্যবহার করেন সেই যুবকের প্রতি, যা মুখ্যমন্ত্রীর পদের সঙ্গে বড়োই বেমানান। তাঁর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ উঠেছে, কোনো

অযোধ্যায় শ্রীরাম জন্মভূমি মন্দিরের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত সন্ত সম্প্রদায়ের একাংশ।

এক সম্প্রদায়কে খুশি করার জন্য তিনি ইচ্ছা করে অযোধ্যায় ভূমিপুজোর দিনে রাজ্যে লকডাউন ঘোষণা করেছেন। আগস্ট মাসের লকডাউনের দিনগুলি মুসলমানদের সুবিধার্থে চারবার বদল করা হয়েছে। কিন্তু বিজেপি দলের অনুরোধ সত্ত্বেও পাঁচ আগস্ট দিনটিকে লকডাউনের বাইরে রাখা হয়নি। পাঁচ আগস্ট টিভি নিউজে আরও দেখা গেছে মেদিনীপুরে ভগবান শ্রীরামের ছবি সংবলিত ফ্লেক্স কে বা কারা ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে রেখেছে। এ সম্পর্কে কেউ কেউ মন্তব্য করছেন— বিজেপির বিরোধিতা করতে গিয়ে এ রাজ্যে যেভাবে হিন্দু এবং হিন্দুধর্মের বিরোধিতা শুরু হয়েছে তা সম্ভবত মুখ্যমন্ত্রীর অঙ্গুলি হেলনে হতে পারে।

যদি সত্যিই তা হয় তাহলে আগামীদিনে মুখ্যমন্ত্রীকে হয়তো বড়োরকমের মূল্য চোকাতে হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ আজ এক চরম অরাজকতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আইনের ক্ষমতাকে বেআইনিভাবে শুধু শান্তিপ্রিয় হিন্দুদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অথচ জেহাদি, দাঙ্গাবাজরা এ রাজ্যে সরকারি প্রশ্রয়ে একের পর এক জেহাদি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তার ফলে আজ এ রাজ্যে হিন্দুর অস্তিত্ব বিপন্ন। স্বাধীনতার পরে এরকম হিন্দু- বিদ্বেষী সরকার এর আগে আর আসেনি। সরকারি ক্ষমতা হাতে পেয়ে যাঁরা হিন্দুর সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিচ্ছেন তাঁরা যেন মনে রাখেন অশুভ শক্তির অবসান ঘটিয়ে এখানে একদিন রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা হবেই হবে। রামমন্দিরের ভূমিপূজা বিরোধী রাজনীতিতে শেষ পেরেক পুঁতে দিল। ■

With Best Compliments from :

PAHARPUR COOLING TOWERS LTD.

PAHARPUR HOUSE

8/1/B, Diamond Harbour Road

Kolkata - 700 027, India

www.paharpur.com

CIN : U02005WB1949PLC018363

Ph. +91-33-4013 3000

Dir. +91-33-4013 3403

Fax : +91-33-4013 3499

vswarup@paharpur.com

ভারতবর্ষে রামচন্দ্রের বিকাশ ও নবনির্মাণ

অনেক ধ্বংস, অন্যায়, আক্রমণ, লুণ্ঠন, ধর্মান্ধতা পার হয়ে এই নির্মাণ-সূচনা একটি গণ-সংগ্রামের পরিণতি। নতুন ভারতের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলো— এরপর তা নব নব নির্মাণের দিকে দুরন্ত গতিতে অগ্রসর হবে। একে প্রতিরোধ করার শক্তি পৃথিবীতে কোনো লুণ্ঠনজীবী রাক্ষসের নেই।

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

'রামায়ণ' নিয়ে বহু মিথ্যা ধারণা প্রচারিত হয়েছে। বঙ্গদেশে রামায়ণ সম্পর্কে নাকি আপত্তি আছে! বাঙ্গালি কৃষ্ণোপাসক। 'কানু ছাড়া গীত নাই'। সম্পূর্ণ ভুল কথা। মহাকবি কত্তিবাস তবে কোন দেশের কবি? শুধু কৃত্তিবাস নন, বাংলা ভাষায় অজস্র কবি রামায়ণ অনুবাদ করেছেন। তাঁদের একটি অসম্পূর্ণ তালিকা দিলাম :

কৃত্তিবাস (পঞ্চদশ শতাব্দী), নিত্যানন্দ, 'অদ্ভুত রামায়ণ' (সপ্তদশ শতাব্দী), শিবানন্দ সেন, ফকিররাম কবিভূষণ, ভবানীশঙ্কর, কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী, জগদরাম রায় (সবাই অষ্টদশ শতাব্দী)। এই পর্যায়ে বিশিষ্ট বঙ্গীয় মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর 'রামায়ণ' (অষ্টাদশ শতাব্দী)। বঙ্গদেশে সংস্কৃত ভাষায় একাধিক কবি রামায়ণ লিখেছেন। অভিকন্দ রচিত 'রামচরিত' (৯ম শতাব্দী), সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' (১০ম শতাব্দীতে) রচিত হয়।

যাঁরা ভাবেন, রামায়ণ উত্তর ভারতীয় আধিপত্যের প্রতীক তাঁদের দুঃখ করার কারণ হতে পারে তথ্যাহরণ করলে। দক্ষিণ

ভারতের চারটি প্রধান ভাষাতে রামায়ণ-কথা অত্যন্ত জনপ্রিয়। সেইসব 'ভাষা রামায়ণ' (অর্থাৎ Vernacular Ramayana) উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের আগে থেকেই প্রচলিত হয়েছে। এ থেকে কী প্রমাণিত হয়? দক্ষিণ ভারতে রামায়ণ ও তাঁর নায়ক শ্রীরামচন্দ্র একান্ত আত্মীয়ের মতো। দেখাই—

তামিল : 'কম্বন রামায়ণ'— দশম শতাব্দীর রামায়ণ অনুসারী কাব্য।

কন্নড় : কবি রামচন্দ্র লিখেছিলেন, 'পম্প রামায়ণ' (১১০০ খ্রি.), নরহরি 'কুমাল বাল্মীকি' নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি লিখেছেন কন্নড় রামায়ণ।

তেলুগু : তেলুগু ভাষাতে 'ভাস্কর রামায়ণ' ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত হয়। এর লেখক রঙ্গনাথ।

জোল্লা ছিলেন মহিলা কবি। তাঁর রামায়ণ 'জোল্লা রামায়ণ' অষ্টাদশ শতাব্দীতে অন্ধ্র ও তেলেঙ্গানা প্রদেশে জনপ্রিয় হয়।

মালায়ালাম : চতুর্দশ শতাব্দীতে 'রামচরিতম্' রচিত হয়— রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অনুবাদ হিসেবে।

কন্নোগা পানিকর লিখেছেন 'কান্নাগা রামায়ণ' ষোড়শ শতাব্দীতে। এঝুত্তাক্কানের 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'ও মালয়ালাম ভাষার অন্যতম জনপ্রিয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর কবি।

সুতরাং দশম থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে দক্ষিণ ভারতের সমস্ত ভাষায় রামায়ণ-কথা আদৃত ছিল। দক্ষিণ ভারতের রাক্ষস সভ্যতা ধ্বংস করতে শ্রীরামচন্দ্র অভিযান করেছেন— এই মিথ্যা তর্ক বহু পরবর্তী সময়ের। এর সঙ্গে দ্রাবিড়-মনের, সংস্কৃতির সম্পর্ক নেই।

উত্তর ভারতে রামায়ণ-কথা কীভাবে বিভিন্ন ভাষায় রচিত, অনুদিত নব নব রূপ পরিগ্রহ করেছে তা বলার আগে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের কথা লিখছি।

অসমীয়া : শঙ্করদেব ষোড়শ শতাব্দীতে 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ' অনুবাদ করেছিলেন। তিনি 'রাম বিজয়' নাটকও লিখেছিলেন। শঙ্করদেবের শিষ্য মাধবদেবও রামায়ণের অংশবিশেষ ষোড়শ শতাব্দীতে রচনা করেন। এর আগে চতুর্দশ শতাব্দীতে মাধব 'কন্দলী রামায়ণ' অনুবাদ করেছিলেন। একই শতাব্দীতে দুর্গাবর লিখেছিলেন 'গীতি রামায়ণ'।

উড়িয়া : বলরাম দাস লিখেছিলেন 'জগমোহন রামায়ণ'। ষোড়শ শতাব্দীর বিশিষ্ট বৈষ্ণব কবি বলরাম দাসের এই কাব্য 'দণ্ডী রামায়ণ' নামেও পরিচিত। সরলা দাসের 'রামায়ণ' দপ্তদশ শতাব্দীতে জনপ্রিয় হয়।

মৈথিলি : চঙ্গুয়া রচিত মৈথিলী 'রামায়ণ' ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে রচিত হয়।

নেপালি : নেপালি ভাষা রামায়ণের রচয়িতা ভানুভক্ত। তাঁর রামায়ণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত।

পশ্চিম ভারতের দুটি বড়ো ভাষাগোষ্ঠী যথাক্রমে মারাঠী ও গুজরাটি। এই দুই ভাষার রামায়ণ সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন করছি—

মারাঠি : সন্ত কবি একনাথ ষোড়শ শতাব্দীতে লেখেন 'ভাষার্থ রামায়ণ'। এটি একাধিক প্রচলিত রামায়ণ-কথার বিপুল কাব্য। বাল্মীকি রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ ও আনন্দ রামায়ণ— একত্র করেছেন সন্তকবি একনাথ।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে (১৬০৮ খ্রি.) রামদাস অনুবাদ করেছেন রামায়ণ।

সপ্তদশ শতাব্দীতে 'রাম বিজয়' লিখেছেন শ্রীধর। শ্রীধরের 'রাম বিজয়' মহারাষ্ট্রে অত্যন্ত জনপ্রিয়। শ্রীধর মহাভারতের অনুবাদও করেন। এই দুটি গ্রন্থ মহারাষ্ট্রের হিন্দু গৃহস্থের বাড়িতে রক্ষিত থাকে।

গুজরাটি : প্রেমানন্দ সপ্তদশ শতাব্দীতে আর গিরধর অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামায়ণ অনুবাদ করেন গুজরাটিতে। গিরধরের রামায়ণের জনপ্রিয়তা অত্যন্ত বেশি।

উত্তর ভারতে কাশ্মীরি ভাষায় রামায়ণ অনুবাদ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। করেছিলেন দিবাকর প্রকাশ ভট্ট। এই 'রামায়ণ' হর-পার্বতীর কথোপকথনছলে রচিত হয়। সেদিক

রামমন্দিরকে রাষ্ট্রমন্দির বলা অধিক যুক্তিযুক্ত হবে। এটি নির্মাণের অর্থ হলো ভারতের স্বাভিমানের জাগরণ। এই মন্দির দেশের সমস্ত শ্রেণীর মানুষের সমস্যা সমাধানের কেন্দ্র তৈরি হবে। এই মন্দির ভারতের উন্নতিরও সূচক।

— ড. প্রণব পণ্ড্যা
প্রধান, গায়ত্রী পরিবার

থেকে এই রামায়ণ আগম শাস্ত্রের অন্তর্গত। আগম হলো মুণ্ডমাল শব্দ। 'আ'-শিবের মুখ থেকে 'আ' গত; গ-পার্বতীর কানে 'গ'-ত; 'ম'-বিষ্ণুর সম্মত। এই তিন শব্দ মিলিয়ে 'আগম' শব্দ নিষ্পন্ন।

হিন্দি ভাষায় ১৫৭৫-১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে তুলসীদাস 'রামচরিত মানস' রচনা করেন। এই রচনা ভারতের শুধু নয়— পৃথিবীর যেখানেই হিন্দিভাষীরা ছড়িয়ে পড়েছেন, সেখানেই তুলসীদাসের রামায়ণ ও 'হনুমান চল্লিশা' জনপ্রিয়।

আরও বহু ভাষায় রামায়ণ কথা অনুদিত হয়েছে। সেসবই প্রমাণ করছে ভারতবর্ষে শ্রীরামচন্দ্রের প্রভাব যুগে যুগে পড়েছে। এই প্রভাবের তুলনা পৃথিবীর অন্য কোনো সাহিত্যকর্মের নেই। রামকে ঘিরে ভারতবর্ষ জাতীয় জীবনের আদর্শ হিসেবে যা কিছু সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল— তা ঘনীভূত হয়েছে।

রামকথার সঙ্গে বেদের দূরশ্রুত প্রতিধ্বনি পাওয়া গেছে। ঋগ্বেদের বৃত্রাসুরের সঙ্গে ইন্দ্রের দ্বন্দ্ব রামকথায় রাবণের বিরুদ্ধে শ্রীরামচন্দ্রের সংগ্রামের মিল পাওয়া যায়। বৃত্র কৃষিকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় জলস্রোতকে অবরুদ্ধ করেন। সীতা পৃথিবী দুহিতা, পৃথিবীতেই ফিরে যাচ্ছেন। শস্য-সম্পদ হিসেবে এই রূপক রামায়ণে বিধৃত হয়েছে। রাক্ষসরাজ রাবাণও এই শস্য সম্পদকে অবরুদ্ধ করছেন। ঋগ্বেদের কাহিনিতে আছে, অবরুদ্ধ গোসম্পদ রক্ষা করেছেন কুক্কুরী সরমা। রামায়ণে সীতাকে আগলে রেখেছেন সরমা। সুতরাং রামকথাকে যাঁরা বিদেশি কাহিনি বলে মনে করেন তাঁরা ভারতীয় সংস্কৃতিকে ঠিকমতো বোঝেন না।

ক্রমে রাম-কথা থেকে সাংস্কৃতিক উপকরণের উপর গঙ্গা গোদাবরীর পলি পড়েছে। ভারতের সবখানে ছড়িয়ে পড়েছে শ্রীরাম-সীতা- লক্ষ্মণ-হনুমানের পদচ্ছাপ। রামায়ণ শব্দটি এসেছে রামের অয়ন বা পর্যটন থেকে। এই পর্যটনে অহল্যাভূমি পত্র-পুষ্পে ফলে-শস্যে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। এক পর্যায়ে রাম-বলরাম একাকার হয়েছেন। রাম ধনুর্ধর, বলরাম হলধর, সীতা কৃষিক্ষেত্রে হলকর্ষণের চিহ্ন, লক্ষ্মণ কৃষিসম্পদ। রাজা জনকও কৃষিকর্ম করতেন। এইসব রূপকের আবরণ থেকে ক্রমে চরিত্রায়ণের স্তরে বিকশিত হলো রাম-কথা।

দেশ জাতি ক্রমে রাম-কথাকে অবলম্বন করে বিকশিত হতে থাকল। রামের মতো সন্তান, অগ্রজ, স্বামী, প্রেমিক, বন্ধু, সেনাপতি আর কে? বনবাসী রামচন্দ্র স্ত্রী-সম্মানের জন্য অযোধ্যায় ফিরে যাননি— ভরতের সাহায্য নেওয়া তাঁর পণ রক্ষার পিতৃসত্য পালনে অন্তরায় ছিল। এই ভাবে এক মহৎ ব্যক্তিত্ব— Person নয়, Personality রামচন্দ্রকে ঘিরে সন্নিবেশিত হয়েছে। দেশের মানুষ যা চায় রামচন্দ্র তারই সুষমামণ্ডিত রূপায়ণ হলো। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, রামায়ণ ঘরের কথাকে বড়ো করে ধরেছে। মহাভারতে পারিবারিক দ্বন্দ্বের কুটিল জটিল পর্ব ও পর্বান্তর, রামায়ণে পারিবারিক সংহতির শান্ত রূপায়ণ। ফলে যা ছিল আরণ্যক-সমাজ ভেঙে গ্রাম্যজীবন প্রতিষ্ঠার গল্প তাই হয়েছে নীতিসম্মত পরিবার, একান্নবর্তী বর্ধিষ্ণু জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও পরিণতির জীবন মহাকাব্য।

কবীর দাস, মীরা-,সুরদাস, সর্বোপরি তুলসীদাস। এঁদের দোঁহায় ভজনে চৌপাঈতে রাম হলেন ব্রহ্মের প্রতিরূপ। রামনাম করলেই কোটি পাপ থেকে মুক্তির ভাবনা ভারতীয় জীবন-রসায়ণে নতুন অমৃত কণা। কৃত্তিবাসের 'রামপাঁচালী'তে পেলাম সুবাহুর পালা— তরণী সেন বধের পালা। সুবাহু রামভক্ত। রাক্ষসকুলে জন্ম হলেও তাঁর ভক্তিতে রামচন্দ্র কৃপা প্রদান করছেন, এমন ভাব পরিকল্পনা 'রামভক্তিবাদ' প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত বহন করে। তরণী সেন রামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেছেন সারা শরীরে, রথে, রথের চূড়ায় 'রাম নাম' লিখে। মৃত্যুর পরও 'তরণী সেনের মুণ্ড রাম নাম বলে'।

বৌদ্ধ ভাষ্যে রাম-রাবণ যুদ্ধ প্রসঙ্গ অনুপস্থিত। কারও কারও মতে অহিংসা-প্রিয় বৌদ্ধরা এই অংশ পরিহার করেছেন। হিন্দু ভারত কিন্তু মনে করে ঈশ্বর অবতীর্ণ হন ধর্ম রক্ষা ও অধর্ম দূর করার জন্য। ধর্ম রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ অনিবার্য। অধর্মের বিনাশ করতে শ্রীরামচন্দ্র পরাঙ্মুখ নন। ফলে রামচন্দ্র শুধু ভক্তি নয় শক্তিরও প্রতীক।

মহাকাল অনির্দিষ্ট গতিশীল তরঙ্গ ভঙ্গ ভারতবর্ষকে বিশ্ব সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলছে। আজ আমরা দেখছি রামচন্দ্রকে অবলম্বন করে এই নতুন ভারতের নবজন্ম হচ্ছে। ১৫২৮-২৯ খ্রিস্টাব্দে রামের জন্মভূমিতে গড়ে উঠেছিল বাবরের আদেশে সেনাপতি মীর বাঁকির তৈরি ধাঁচাটি। এই মহাকালের মহাবৃত্তে একটি বিন্দুর মতো অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ। ভারত ইতিহাসে ভিক্ষুক বেশী লুটেরারা যত চেষ্টাই করুক বারংবার ভেঙে ফেলা 'সোমনাথ' মন্দিরের মতো সে আবার উঠে আসবে। আসবেই। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বলেছিলেন হুমো পাখির কথা। মাটিতে পড়তে পড়তে যাদের ডিম ফোটে, ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে আবার সূর্যের দিকে উড়ে যায়। সোমনাথ মন্দির উঠে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করেছে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ভস্মাচ্ছাদিত সাধনক্ষেত্র থেকে পুনরুজ্জীবিত হয়। এটাই ভারতের ভবিষ্যৎ।

একই কথা রামজন্মভূমিতে শ্রীরামের ভব্য মন্দির গড়ে ওঠার ইতিহাসে। অনেক ধ্বংস, অন্যায়, আক্রমণ, লুণ্ঠন, ধর্মান্ধতা পার হয়ে এই নির্মাণ-সূচনা একটি গণ-সংগ্রামের পরিণতি। ধ্বংসকে সৃষ্টিতে পরিণত করার অমৃত আমাদের পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত ধন। রামচন্দ্র তাকে রক্ষা করেন— তিনি ভারতের আত্মমর্যাদার প্রকৃত ধারক। নতুন ভারতের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলো— এরপর তা নব নব নির্মাণের দিকে দুরন্ত গতিতে অগ্রসর হবে। একে প্রতিরোধ করার শক্তি পৃথিবীতে কোনো লুণ্ঠনজীবী রাক্ষসের নেই। ■

রামজন্মভূমি অযোধ্যা ছিল সর্বোৎকৃষ্ট মহানগরী

দুর্গাপদ ঘোষ

গত ৫ আগস্ট বেলা ১২-১৫ মিনিটে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী অভিজিৎ মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে অযোধ্যায় রামজন্মভূমি মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে। বাল্মীকি রামায়ণ অনুযায়ী উল্লেখিত এই নক্ষত্রযোগে রামচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল। এদিনের এই সমারোহের ৩১ বছর আগে ১৯৮৯ সালের ৯ নভেম্বর দেবোত্থান একাদশীতে কামেশ্বর চৌপালের হাতে রামন্দিরের শিলান্যাস হয়েছিল। কিন্তু অপরিসীম সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বাধাবিঘ্নে সে এখন অতীতের স্মৃতির অতলে। প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মহাসমারোহে এবারের এই ভূমিপূজন অন্য দিক দিয়েও বেশি মহত্ত্বপূর্ণ। কারণ স্বর্গত অশোক সিঙ্ঘলের নেতৃত্বাধীন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের চেষ্টায় দেশের প্রায় সমস্ত সাধুসন্তকে নিয়ে গঠিত রামজন্মভূমি ন্যাস বাস্তুশাস্ত্রবিদ চন্দ্রকান্তভাই সোমপুরাকে দিয়ে রামজন্মভূমি মন্দিরের যে নকশা প্রস্তুত করিয়েছিলেন এখন তার কিছু পরিবর্ধন করা হয়েছে। যেমন সামগ্রিকভাবে মন্দির পরিসরের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি। আগের নকশায় গর্ভগৃহ ছাড়াও নৃত্যমণ্ডপ, কীর্তন মণ্ডপ-সহ মোট আরও তিনটে মন্দির নির্মাণের কথা ছিল। এখন তার সঙ্গে আরও দুটো মিলে ক্রমপর্যায়ে মোট পাঁচটা মণ্ডপ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগের নকশায় মণ্ডপগুলো তিন তলা হবে ঠিক ছিল। এখন তা পাঁচ তলা করা হচ্ছে। তার ফলে মূল মন্দির বা গর্ভগৃহ মন্দিরের চূড়ার উচ্চতাও আরও ২০ ফুট বৃদ্ধি করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এখন মন্দির হবে ৩৬০ ফুট দীর্ঘ, ২৩৫ ফুট চওড়া এবং চূড়ার উচ্চতা হবে ১৬১ ফুট। পুরো মন্দির পরিসরের নামকরণ করা হয়েছে 'রামজন্মভূমি মন্দির তীর্থ। অর্থাৎ মন্দির ছাড়াও আদতে

তীর্থক্ষেত্রটা হবে রামজন্মভূমি। সেটা যে প্রস্তাবিত মন্দির-সহ সমগ্র অযোধ্যা সেকথা বলা বাহুল্য।

অযোধ্যার মাহাত্ম্য কেবল একটা অতি উন্নত ও প্রাচীন নগর বলেই নয়। স্বয়ং পুরুষোত্তম রামচন্দ্রই তাঁর জন্মভূমি সম্পর্কে সে মর্যাদা ব্যক্ত করে গেছেন। বাল্মীকি রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে লঙ্কা বিজয়ের পর তিনি যখন লক্ষ্মণকে বললেন, 'অপি স্বর্ণময়ী লঙ্কা ন মে রোচতে লক্ষ্মণ। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সি।।' তখনই তিনি সর্বকালীন দেশাত্মবোধের গরিমামণ্ডিত কথা শুনিয়ে দিলেন যে জননী এবং জন্মভূমি স্বর্গের চাইতেও গরিমাময়ী। সেদিন থেকে অযোধ্যা— যাকে যুদ্ধে জয় করা যায় না তা কেবল যুদ্ধে নয়, সমস্ত দিক দিয়েই জয়ের ঊর্ধ্বে। সুদীর্ঘকাল ধরে বহু কৌশলের পরেও আপামর মানুষের মন থেকে, হৃদয়াবেগ থেকে অযোধ্যাকে কেউ জিতে নিতে পারেনি। অযোধ্যা—নামটা কানে বাজার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের প্রায় সমস্ত প্রান্তের মানুষের মনের পর্দায় ভেসে ওঠে রামচন্দ্র এবং তাঁর জন্মভূমি। মহর্ষি বাল্মীকি তাঁর রচিত রামায়ণের বালকাণ্ডে রামচন্দ্রের ব্যক্তিত্বকে যেমন 'সমুদ্র ইব গাম্ভীর্যে ধৈর্যেন হিমবানিব' বলে ব্যাখ্যায়িত করেছেন সেইসঙ্গে ওই কাণ্ডের প্রথম সর্গের ৫ থেকে ২০ শ্লোকে আখ্যায়িত করেছেন অযোধ্যার বর্ণনাও। এখন যখন সেই রামজন্মভূমি পুনরায় তীর্থের মর্যাদায় ভূষিত হলো তখন সেই অযোধ্যার দিকে একবার ফিরে তাকানো যাক।

অযোধ্যায় শ্রীরামলালাকে প্রদক্ষিণ করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

অযোধ্যা রামজন্মভূমি হলেও এই নগরী স্থাপন করেন রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ তথা বিশ্ববিশ্রুত মনুস্মৃতি গ্রন্থের রচয়িতা রাজা মনু। বালকাণ্ডের ষষ্ঠ শ্লোকে বলা হয়েছে—

'অযোধ্যা নাম নগরী তত্রাসীল্লোক বিশ্রুত।
মনুনা মানবেন্দ্রেণ যা পুরী নির্মিতা স্বয়ম্'।।

রাজা মনুর যে বাস্তব অস্তিত্ব ছিল, তিনি যে একজন ঐতিহাসিক পুরুষ ছিলেন তা আজ বহুভাবে স্বীকৃত ও প্রমাণিত। তাঁর লেখা স্মৃতি সংহিতা ছাড়াও অন্যতম প্রমাণ হলো, খ্যাতনামা পর্যটক এফ আই পার্জিটর-এর লেখা 'Ancient Indian historical tradition' গ্রন্থ। লক্ষণীয়, পার্জিটর 'হিস্টোরিক্যাল' বা ঐতিহাসিক শব্দই ব্যবহার করেছেন। লিখেছেন, 'বৈবস্বত মনুর ৯ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন ইক্ষ্বাকু।' প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারও ইক্ষ্বাকুকে ঐতিহাসিক পুরুষ মান্যতা দিয়ে বলেছেন, এই ইক্ষ্বাকু বিকুক্ষিই হলেন ইক্ষ্বাকু বংশের (সূর্যবংশ) প্রতিষ্ঠাতা। 'The vidic Raj' গ্রন্থের ২৭৬ পৃষ্ঠায় ড. মজুমদার আরও জানিয়েছেন যে, 'রাজা মনু তাঁর সাম্রাজ্যকে ১০ ভাগে ভাগ করেন এবং তার মধ্যভাগের শাসনভার তুলে দেন ইক্ষ্বাকুকে। কালান্তরে সেই অংশের নাম হয় কোশল। সেই কোশলের রাজধানী হলো অযোধ্যা।

অযোধ্যাই যে রামচন্দ্রের জন্মস্থান একথা মূল ভারতীয় ঐতিহাসিকরা ছাড়াও অনেক মুসলমান ঐতিহাসিক এবং লেখকও লিখে গেছেন। যেমন মৌলনা হাকিম সইদ আবদুল হাই (১৯৭২)-এর লেখা 'হিন্দুস্তান-এ-ইসলামি আহদ', মৌলবি আবদুল করিম (১৮৮৫)-এর 'গুমগস্ত-এ-হালত-এ-অযোধ্যা', হাজি মহম্মদ ইবন (১৮৭৮)-এর লেখা 'জিয়া-এ-আখতার', আল্লামা মহম্মদ নাজমু গনি খান (১৮৯৫)-এর 'তেহরিক-এ-অবধ' ইত্যাদি গ্রন্থে পরিষ্কারভাবে অযোধ্যাকে রামচন্দ্রের জন্মস্থান বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। লিপি বিশেষজ্ঞ ও ঐতিহাসিক ড. কে বি রমেশ, ড. স্বরাজ প্রকাশ গুপ্তা, ড. ঠাকুর প্রসাদ বর্মা এবং ড. সুধা মাল্য— চারজনেই এক সুরে রায় দিয়েছেন যে অযোধ্যাই হলো রামজন্মস্থান এবং এখানেই (যেখানে রামমন্দির পুনর্নির্মিত হচ্ছে) নির্মিত হয়েছিল সুরম্য রামজন্মভূমি মন্দির। সর্বপ্রথম তা নির্মাণ করেন রামচন্দ্রের পুত্র কুশ। পরে গুপ্তযুগে তার দৃষ্টিনন্দন সংস্কার করেন রাজা বিক্রমাদিত্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বহিরাক্রমণকারী মোগল বাদশাহ বাবরের নির্দেশে ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে সেই মন্দির চূর্ণ করে তার ভগ্নসামগ্রী দিয়ে সেই অর্ধভঙ্গ মন্দিরের ওপরই তথাকথিত বাবরি মসজিদ বানান বাবরের এক সেনাপতি মীর বাকি খাঁ।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পূর্বতন শ্যামদেশ বা বর্তমানে থাইল্যান্ডে কেবল রামচন্দ্রই নন, তাঁর পবিত্র জন্মভূমি অযোধ্যাও এতটাই জনপ্রিয় যে অযোধ্যার অনুসরণে সেদেশে অযুধ্যা (স্থানীয় উচ্চারণে আয়ুথারা) নগরী স্থাপিত হয়েছে। কেবল তাই নয়, সেই অযুধ্যা দু' দুবার সেদেশের রাজধানীর মর্যাদাও লাভ করেছে। একবার ১৩৫০ থেকে ১৪৬৩ (১১৩ বছর) এবং আর একবার ১৪৮৮ থেকে ১৭৬৭ (২৬৯ বছর) খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে অযুধ্যাকে প্রথম রাজধানী করেন রাজা প্রথম রামাতিবোধি। সেদেশে রামাতিবোধি শব্দের অর্থ হলো রামাধিপতি।

মহর্ষি বাল্মীকি রচিত রামায়ণের সূত্র ধরে কেবল ভারতবর্ষেই নয়, বর্তমান থাইল্যান্ডে, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, কম্বোডিয়া, ফিলিপিনস, জাপান, লাওস, ভিয়েতনাম, মায়ানমার (পূর্বতন ব্রহ্মদেশ), শ্রীলঙ্কা-সহ সারা বিশ্বে এ পর্যন্ত নানা শিরোনামে ৬০ খানারও বেশি রামায়ণ রচিত হয়েছে। তার প্রায় সবগুলোতেই রামচন্দ্রের পাশাপাশি তাঁর জন্মভূমি অযোধ্যাও কম-বেশি গুরুত্ব লাভ করেছে। অযোধ্যার পূর্বে তার চাইতে

এই বিশাল এবং অসামান্য মন্দির নির্মিত হলে রামজন্মভূমি অযোধ্যার তীর্থক্ষেত্রের গরিমা তো বটেই, নৈসর্গিক সৌন্দর্যও বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। রামজন্মভূমি মন্দিরের মহিমায় রামতীর্থ অযোধ্যা মহাতীর্থের গরিমামণ্ডিত হবে।

উন্নত নগর সভ্যতার বর্ণনা পাওয়া যায় না। কাশী প্রাচীনতম হলেও তা অধ্যাত্মিক ক্ষেত্র হিসাবে পরিচিত। অযোধ্যা নামের উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় সুপ্রাচীন অথর্ববেদের এক সুক্তে। সেখানে অযোধ্যাকে দেবতাদের পুরী বলা হয়েছে—

'অষ্টচক্রা নবদ্বারা দেবানাং পুরযোধ্যা।
অস্যাং হিরণ্যয়ঃ কোশঃ স্বর্গো জ্যোতিষাবৃতাঃ।।

রামচন্দ্র তো তাকে স্বর্গের চেয়েও গরিয়সি বলে গর্ব প্রকাশ করেছেন। তবে বেদের অঙ্গ থেকে অযোধ্যা নামের পরিচয় ঘটলেও তার স্থানমাহাত্ম্য সম্প্রসারিত হয়েছে রামচন্দ্রের জন্মস্থান বলেই। বাল্মীকি অযোধ্যাকে স্পষ্টভাবেই রামজন্মভূমি বলে জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে নগরীর যে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন তা বস্তুত আজকালকার 'স্মার্ট সিটি'-র সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বলা নিষ্প্রয়োজন, কেবল গগনচুম্বি অট্টালিকার জন্য কোনও নগর বা মহানগরকে এই অভিধা দেওয়া হয় না। আরও অনেক দিক যেমন নগর পরিকল্পনা, প্রযুক্তি ও কারিগরি ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধাদি যেমন জল, আলো, বাতাস, নিকাশি ব্যবস্থা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, অট্টালিকাগুলোতে ওঠা-নামার সুবন্দোবস্ত, সবুজায়ন, রাস্তাঘাট, নগরীতে গমনাগমনকারীদের বিশ্রামাগার ও শৌচালয়, আহারাদির ব্যবস্থা, যাতায়াত বা পরিবহণ, যান নিয়ন্ত্রণ, মানুষের জীবনযাত্রার মান খেলাধুলো, সকাল-বিকাল পদচারণা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন এমনকী রোজগারের সংস্থান এবং বিশেষ করে সব শ্রেণীর নাগরিকের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইত্যাদি পর্যালোচনা করে তবেই স্মার্ট সিটির শিরোপা দেওয়া হয়ে থাকে। এই সমস্ত বিচারে বর্তমানে বিশ্বে প্রথম ৫টা স্মার্ট সিটির এক নম্বরে রয়েছে স্পেনের বার্সিলোনা। দ্বিতীয় আমেরিকার নিউ ইয়র্ক, তৃতীয় ইংল্যান্ডের লন্ডন, চতুর্থ ফ্রান্সের নীস আর পঞ্চম স্থানে রয়েছে এশিয়ার সিঙ্গাপুর।

বাল্মীকি রামায়ণ অনুসারে অযোধ্যার অবস্থান হলো সরযূ নদীর তীরে। নগরীর আয়তন ছিল দৈর্ঘ্য ১২ যোজন এবং প্রস্থে ৩ যোজন (অনেক পণ্ডিতের মতে এক যোজন হলো ১২ মাইল বা প্রায় ১৮.৫ কিলোমিটার)। উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকা কোশল প্রদেশের রাজধানী।

'কোশল নাম মুদিতঃ জনপদ স্ফীতো মহান।
নিবিষ্ট সরযূতীরে প্রভুত ধনধ্যন্যবান।।
আয়তন— 'অযোধ্যা দশ চ দ্বে চ যোজনানি মহাপুরী।
শ্রীমতী ত্রীণি বিস্তীর্ণা সুবিভক্ত মহাপথা।।'

এইসব বর্ণনা থেকে জানা যায় রামজন্মভূমির অধিবাসীরা ছিলেন সম্পন্ন, সর্বদা সুখী ও সদাপ্রসন্ন। অযোধ্যা ছিল সর্বদা ধনধান্যে ভরা। তখন তিন লোকের মধ্যে অযোধ্যা ছিল সর্বোৎকৃষ্ট নগরী যাকে মহাপুরী বা মহানগরী বলা হয়েছে। বাল্মীকির বর্ণনায় আরও প্রতীত হয় যে অযোধ্যা মহাপুরী ছিল অতি সুন্দর, সাজানো-গোছানো, ঝকঝকে-তকতকে, লম্বা-চওড়া এবং আজকালকার মতো ডিভাইডার এবং মাঝে মাঝে বাইপাস সংসযুক্ত রাজমার্গ বা সড়ক সমৃদ্ধ। অর্থাৎ রাস্তার বিভাজন ছিল সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত। সেইসব পথঘাট প্রতিদিন নিয়মিতভাবে জল দিয়ে ধোওয়া হতো।

'রাজমার্গেন মহতা সুবিভক্তেণ শোভিতা।
মুক্তপুষ্পাবকীর্ণের জলসিক্তেন নিত্যশঃ।।

বাল্মীকির বর্ণনায় আরও জানা যায় যে, প্রশাসনিক ব্যবস্থা সুচারু রাখার জন্য অযোধ্যাকে অষ্টচক্রে বা ৮ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। নগরীর মধ্যে প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য প্রধান তোরণ ছাড়াও আরও ৮টা দ্বার (অষ্টচক্রা নবদ্বারা) ছিল। সেগুলো তো বটেই, নগরীর মধ্যেও সর্বত্র আদ্যান্ত আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল। এমনকী কুশল কারিগরদের তৈরি নানা ধরনের যন্ত্রপাতি এবং সশস্ত্র পাহারার বন্দোবস্ত ছিল।

'কপাটতোরণংবতীং সুবিভক্তান্তরাপণাম্।
সর্বযন্ত্রায়ুধতীমুপেতাং সর্বশিল্পীভিঃ।।'

আরও যেসব বর্ণনা রয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, অযোধ্যায় সুউচ্চ অনেক অট্টালিকা ছিল যাদের শীর্ষে সূর্য চিহ্নিত গৈরিক পতাকা শোভা পেত। স্থানে স্থানে নির্মিত ছিল দৃষ্টিনন্দন ও মনোরম উদ্যান। সর্বসাধারণের জন্য নগরীতে অনেকগুলো কূপ খনন করা ছিল যা থেকে সবাই সুপেয় জল পেতেন। বিনোদন ব্যবস্থা ছিল এত উন্নত যে এমনকী মহিলাদের জন্য ছিল পৃথক নাট্যশালাও। বলাবাহুল্য, লঙ্কা বিজয় করে সীতা উদ্ধারের পর রামচন্দ্র যেদিন অযোধ্যায় ফিরে আসেন সেদিন তাঁদের স্বাগত জানানোর জন্য অযোধ্যাকে দীপালোকে সাজানো হয়েছিল। সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে দীপাবলী উৎসব যা এখনও স্বমহিমায় উদ্‌যাপিত হয়ে চলেছে। অতঃপর এই বিশাল এবং অসামান্য মন্দির নির্মিত হলে রামজন্মভূমি অযোধ্যার তীর্থক্ষেত্রের গরিমা তো বটেই, নৈসর্গিক সৌন্দর্যও যে বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রামজন্মভূমি মন্দিরের মহিমায় রামতীর্থ অযোধ্যা মহাতীর্থের গরিমামণ্ডিত হবে।

অযোধ্যার রামমন্দির হয়ে উঠুক আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রমন্দির

রাম যেমন গোটা ভারতের বিবিধতার মধ্যে একতার প্রতীক, তেমনি তাঁর মন্দির হয়ে উঠবে আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রমন্দির। এই মন্দিরের দ্বার চিরদিন সবার জন্য খোলা থাকবে। সব ধর্ম সব সম্প্রদায়ের মিলন মন্দির হয়ে উঠবে অযোধ্যার রামমন্দির।

গৌতম কুমার মণ্ডল

শুধু আমাদের দেশেরই নয়, সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হিন্দু সমাজের বড়ো প্রিয়, বড়ো পবিত্র একটি জায়গার নাম অযোধ্যা। সরযূনদীর তীরে এই প্রাচীন নগরীতেই একসময় রাজা রামচন্দ্র বিরাজ করতেন বলে আমরা বিশ্বাস করি। তাই আমাদের তীর্থভূমি অযোধ্যা। এ দেশের হিন্দুসমাজের কাছে রামচন্দ্র শুধু শ্রেষ্ঠ রাজাই নন, তিনি ভগবান। তিনি প্রজাহিতৈষী রাজা, তিনি শ্রেষ্ঠ পতি, শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, শ্রেষ্ঠ পুত্র, শ্রেষ্ঠ ভক্তবৎসল। রামচন্দ্রের কাহিনিই তো আমাদের প্রাচীনতম মহাকাব্য রামায়ণ। রবীন্দ্রনাথ আমাদের জানিয়েছেন, রামায়ণ রামচন্দ্রের রাবণের উপর বিজয়ের কাহিনিই নয়, তা আমাদের গৃহজীবনের শ্রেষ্ঠত্বের কাব্য। রামায়ণ মহাকাব্যকে কেন্দ্র করে আমাদের গৃহ এবং পরিবার-কেন্দ্রিক ভারতসংস্কৃতি আবহমানকাল ধরে তার গৌরব ধরে রেখেছে। এই চলিষ্ণু ও জয়িষ্ণু ভারতসংস্কৃতির মূলকথা রামচন্দ্র। কিন্তু আমাদের এমন দুর্ভাগ্য যে রামের জন্মস্থানের মন্দির পুনরুদ্ধার করতেও হিন্দুসমাজকে শতকের পর শতক ধরে অপেক্ষা করতে হলো, দশকের পর দশক ধরে আইনি লড়াই লড়তে

অযোধ্যায় শ্রীরাম জন্মভূমি মন্দিরের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত বক্তব্য রাখছেন।

হলো। এই লড়াইয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলে গেল, বহুজনের প্রাণ বলিদান হলো, বহু রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলন হলো। অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের এক সুচিন্তিত রায়ে প্রশস্ত হলো রামমন্দির নির্মাণের পথ। গত ৫ আগস্ট এই মন্দির নির্মাণের কাজ ভিত্তিপুজোর মাধ্যমে শুভ সূচনা করলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রতিটি ভারতবাসীর কাছে তাই ২০২০ সালের ৫ আগস্ট একটি পবিত্র দিন হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রামমন্দির নির্মাণ নয়, রামমন্দির পুনর্নির্মাণ। আগে সে মন্দির ছিলই। এ তো ঐতিহাসিক সত্য। বাবরের সেনাপতি মীর বাকি তা ধ্বংস করে বাবরের নামাঙ্কিত মসজিদ বানিয়েছিল। মধ্যযুগে বহুমন্দির অত্যাচারী মুসলমান শাসকেরা লুঠ করেছে, ধ্বংস করেছে। ধ্বংসস্থলে নির্মিত হয়েছে মসজিদ। সেটা হয়তো তাদের ধর্মেরই অঙ্গ । কিন্তু সেই তিক্ত ইতিহাসের কথা এখন আর না বলাই ভালো। এখন সামনে এগিয়ে যাবার সময়, ভেদাভেদ ভুলে যাবার সময়। আমাদের মনে রাখা দরকার, এ দেশের মুসলমান সংগঠন মন্দির নির্মাণে অর্থসাহায্যও করেছেন বলে শুনেছি। তবে দু'একজন মুসলমান রাজনৈতিক নেতা বিষয়টিকে তো সহজে মেনে নিতে পারছেন না। কারণ তাঁদের রাজনীতির মূল কথাই হলো বিদ্বেষ। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ধর্মকে নিয়েই যাঁরা রাজনীতি করেন, নির্বাচনের জন্যই যাঁরা মন্দির, মসজিদ, গির্জায় ছুটোছুটি করেন আর বিভিন্ন ভেক ধারণ করেন, তাঁদের রাজনীতি বন্ধ করে দওয়া উচিত। ধর্মকে নিয়ে যাঁরা রাজনীতি করেন তাঁরা ভেবে পাচ্ছেন না এখন কোথাও কোনো নির্বাচন নেই, তাহলেও প্রধানমন্ত্রী রামমন্দির নির্মাণের ভিত্তিপুজোয় এলেন কেন? কেনই বা উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকার এই করোনার সংকটকালে মন্দির নির্মাণের রাজসূয় যজ্ঞ করলেন? আসলে তথাকথিত রাজনীতিবিদেরা সবকিছুকেই ভোটের নিক্তিতে বিচার করেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে গিয়েছেন সময় অনেকদূর এগিয়ে গেছে। এদেশের যুব সমাজের ও সাধারণ মানুষের চিন্তাভাবনা আর আগের মতো নেই। একান্তই ভোটকেন্দ্রিক রাজনীতি এখন আর চলছে না।

পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবী সমাজের ভাবনা কী রামমন্দির প্রসঙ্গে? এই বুদ্ধিজীবী সুশীল সমাজ মনে করেন রামমন্দির নির্মাণ করে কী হবে? কী লাভ তাতে? কমিউনিস্টরা বলেন রামের জন্য নয়, মন্দিরের জন্য নয়, আসল লড়াইটা হলো ভাত-কাপড়ের লড়াই। তাঁরা নাকি সেই লড়াই-ই লড়ছেন। বাম বুদ্ধিজীবী সমাজের মূল সন্দেহ রামচন্দ্র বলে কেউ কোনোদিন ছিলেন কি না সে নিয়েই। তাঁদের কাছে মানুষের কয়েক হাজার বছরের ভক্তি ও বিশ্বাসের কোনো মূল্য নেই। তাই এ রাজ্যের সুশীল সমাজ সুযোগ পেলেই ভুলিয়ে দিতে চান যে রাম বলে কেউ কোনোদিন ছিলেন। এমনকী কচিকাঁচাদের মনেও রাম কেন্দ্রিক ধারণাটিকে নিজেদের মনের মতো করে তাঁরা গড়ে তুলতে চান। রাম এই নামটিকে কতদূর কষ্টকল্পনা করে ইংরেজি রোম শব্দের সঙ্গে মেলানো যায় এবং অতীতে যাঁরা ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন তারা সবাই যে রাম — এ ধরনের অবান্তর কল্পনা করা যায় তা পেতে পারি এ রাজ্যের ষষ্ঠ শ্রেণীর ইতিহাস পুস্তকে। আমরা তো জানি

ফ :৪

আমি ১৯৯০ থেকে রামমন্দির আন্দোলনে যুক্ত আছি। বহুবার মনে সন্দেহের উদয় হয়েছে যে, রামমন্দির নির্মাণ দেখে যেতে পারব কি না, কিন্তু আজ ভগবানের কৃপায় সেই স্বপ্ন সাকার হতে চলেছে।

— কিশোর কুণাল
প্রতিষ্ঠাতা, মহাবীর মন্দির,
পাটনা

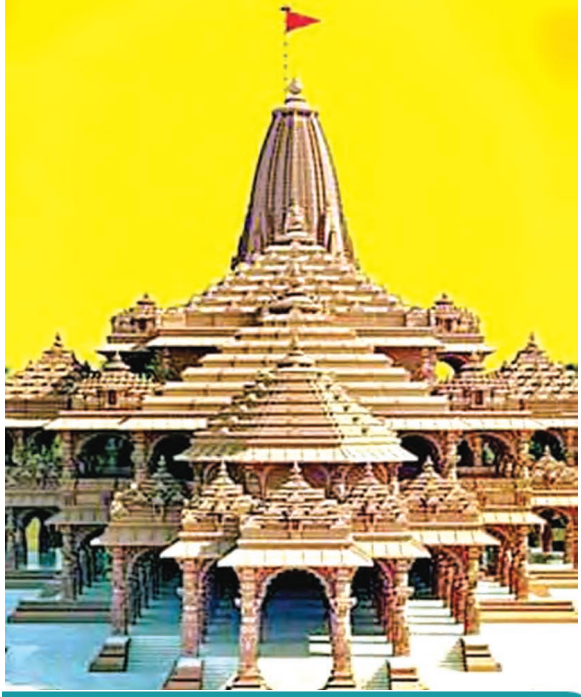

আরও অনেক বই থেকে রাম নামকেই তুলে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। নইলে রামধনু কোনোদিন রংধনু হয়! এসব কৃতিত্ব এ রাজ্যের তথাকথিত বিদ্বজ্জনদেরই। এ রাজ্যের মানুষের মধ্যে এমন ধারণা তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে যে রাম অবাঙ্গালিদের উপাস্য দেবতা।

বাঙ্গালি রীতিনীতির সঙ্গে রাম-ভাবনার কোনো মিল নেই বলে আমাদের শেখানো হয়েছে। রাম ও সীতা যেন একান্তই বহিরাগত। কবি কৃত্তিবাস যেন বিরাট এক ভুল করে রামায়ণের বাংলা অনুবাদ করে ফেলেছিলেন! সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য'তে দেখিয়েছেন দীনেশচন্দ্র সেন কেন সীতাকে 'ঘাঘরাপরা বিদেশিনী' এই আখ্যা দান করিয়া, বাঙ্গলার হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিতে চাহেন।' 'রামায়ণী কথা'র লেখক এভাবে সীতাকে দেখিয়েছেন তাঁর প্রিয় এবং প্রচারিত পল্লীগাথার নায়িকাদের প্রতি পক্ষপাত দেখানোর জন্য। অন্য কোনো কারণে নয়। সেই কবে কৃত্তিবাস আর্য রমণী সীতাকে বাঙ্গালির ঘরের বধূ করে দিয়েছেন তবু কেন আমরা এখনো রাম নামে বহিরাগতের গন্ধ খুঁজব? ভারত সংস্কৃতির মূলকথা রামচন্দ্র এটা এ রাজ্যের বুদ্ধিজীবীরা যত দ্রুত বোঝেন ততই মঙ্গল। ভারত সংস্কৃতিকে বাদ দিলে বাঙ্গালির সংস্কৃতি বলে যে কিছু থাকে না তা সুনীতিকুমারের মতো পণ্ডিতেরা আমাদের বহু আগেই জানিয়ে দিয়ে গেছেন।

গত ৫ আগস্ট রামমন্দিরের ভিত্তিপুজোর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ভাবে নির্মাণকাজ শুরু করে প্রধানমন্ত্রী খুব মর্মস্পর্শী একটি বক্তব্য রেখেছেন। মঞ্চে ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপাল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত ও রামমন্দির পুনরুদ্ধার আন্দোলনের আজীবন সংগ্রামী স্বামী নিত্যগোপাল দাস। মঞ্চের নীচে শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন সারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা এ দেশের ৩৬ টি সাধক পরম্পরার ১৪০ জন সাধু-সন্ত। দূরদর্শনের সম্প্রচারে সারা ভারত এই অনুষ্ঠান ও পুজোপাঠ দেখেছে। পুজোপাঠের পর অনুষ্ঠানের শেষ বক্তা ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী সুবক্তা সবাই জানেন। কিন্তু তিনি যে সাজ-সজ্জা-শৌখিনতাতেও দেশের এক নম্বর ব্রান্ড তা আমরা অনেক সময়ই ভুলে যাই। এদিনের অনুষ্ঠানে তিনি এলেন সাদা ধুতি, হালকা সোনালি রঙের পাঞ্জাবি এবং মানানসই গেরুয়া উত্তরীয় পরে। শ্বেতশুভ্র লম্বা কুঞ্চিত কেশ আর দীর্ঘদিনের বেড়ে ওঠা দাড়ি-গোঁফে তাঁকে মনে হচ্ছিল যেন কোনো ঋষিপুরুষ। বয়স তাঁর সত্তর ছুঁই ছুঁই অথচ চোখ মুখ থেকে বেরিয়ে আসছিল যেন দিব্য বিভা। এই মন্দির কী ও কেন — প্রধানমন্ত্রী তা যেমন বোঝালেন তেমনি শুধু ভারতই নয়, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতেও রাম ও রামায়ণের প্রভাব কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত তা আমাদের আর একবার জানিয়ে দিলেন। মন্দির প্রসঙ্গে 'আধুনিক' কথাটির উপর বেশি জোর দিলেন। রামচন্দ্রের ভাবনা, তাঁর প্রজাহিতৈষী চিন্তা, জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা সব কিছুকে ছুঁয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী। নিয়ে এলেন গান্ধীর 'রামরাজ্য' কথাটির প্রসঙ্গ। সবকিছু মিলিয়ে প্রধানমন্ত্রীর এদিনের বক্তব্য আমাদের শোনা তাঁর সেরা বক্তব্যগুলির একটি।

কিন্তু সমালোচনা তো করতেই হবে। তাই সন্ধ্যায় আমাদের রাজ্যের চ্যানেলে চ্যানেলে চলল সেই বক্তব্যের কাটাছেঁড়া। প্রধানমন্ত্রী নাকি ৫ আগস্টকে ১৫ আগস্টের সঙ্গে তুলনা করে রামমন্দির নির্মাণকেও দ্বিতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ বলেছেন। কিন্তু তিনি তা বলেননি। তিনি যা বলেছেন তার মূল কথা হলো ১৫ আগস্ট যেমন অনেক মানুষের, স্বাধীনতা সংগ্রামীর ত্যাগ ও বলিদানের প্রতীক, তেমন ৫ আগস্টও হলো অনেক মানুষের শতকের পর শতকের লড়াই ও আত্মবলিদানের প্রতীক। দুটি দিন দু'রকমের সংগ্রামের পর সফলতার দুটি প্রতীক। এই কথায় ভুল কিছু নেই। তিনি কখনোই মন্দির নির্মাণকে স্বাধীনতার দ্বিতীয় লড়াই বলেননি। কিন্তু না বললেও তর্ক

করতে অসুবিধা কোথায়? বাংলা নিউজ চ্যানেলের সান্ধ্য আসরগুলি ধারে ও ভারে দিন দিন বড়ো দুর্বল অসার হয়ে উঠছে। মনে হয় মানুষ এগুলি আর দেখেন না, এঁদের কথা আর শোনেন না।

রাম যেমন গোটা ভারতের বিবিধতার মধ্যে একতার প্রতীক, তেমনি তাঁর মন্দির হয়ে উঠুক আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রমন্দির। আমরা চাইব এই মন্দিরের দ্বার চিরদিন সবার জন্য খোলা থাকুক। কোনো সংকীর্ণতাকে এই মন্দির যেন প্রশ্রয় না দেয়। সব ধর্ম সব সম্প্রদায়ের মিলন মন্দির হয়ে উঠুক অযোধ্যার রামমন্দির। অতীতে এক একটি মন্দির রাজার দ্বারা রাজকোষের অর্থে গড়ে উঠেছে। এই আধুনিক ভারতের মন্দির রাজকোষের অর্থে নির্মিত হবে না। জনগণের দানে নির্মিত হবে। আমরা জানি মন্দির নির্মাণ ট্রাস্ট মন্দির নির্মাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত। এও জানি মন্দির নির্মাণের জন্য দেশ-বিদেশের বহু মানুষ ও সংগঠন ধর্মমত ও বিশ্বাস নির্বিশেষে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ১৯৮৯ সালে শিলাপুজোর সময় দেশের কয়েক কোটি সাধারণ, দরিদ্র মানুষ মন্দির নির্মাণকল্পে মাথাপিছু ১ টাকা দিয়েছেন। সবার উদ্যোগে, সাহায্যে, সবার পরশ নিয়ে রামমন্দিরের পুনর্নির্মাণ হতে চলেছে।

অযোধ্যার রামমন্দির হবে ভব্য, সুন্দর, বৃহৎ। মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে সংগ্রহশালা, গবেষণাগার, প্রেক্ষাগৃহ, অতিথিভবন, থাকবে সবুজের সমারোহ, থাকবে জল ও শৌচালয়ের ব্যবস্থা সবকিছুই। এই অতি প্রাচীন নগরীতে মন্দিরকে কেন্দ্র করেই সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পুণ্য অর্জন ও পর্যটনের কারণে বহু মানুষ এখানে আসবেন। এলাকার অর্থনীতিতে জোয়ার আসবে সে কথাও সত্য। কিন্তু আসল বিষয় হলো মন্দিরের 'আধুনিক' রূপ। প্রধানমন্ত্রী এই শব্দটির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। মন্দির পরিচালনার সর্বক্ষেত্রে যেন আধুনিকতা থাকে। এই মন্দির আগামীদিনের মানুষের কাছে হিন্দুধর্মের উদারতার, তার সবাইকে গ্রহণ করার, তার মুক্ত চিন্তার কথা যেন প্রচার করতে না ভোলে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এই মন্দির যেন 'নরকে নারায়ণ' হিসেবে দেখে, 'বর্তমানকে অতীতের সঙ্গে জোড়ে'। হিন্দু ধর্মের সত্য ও অহিংসার কথা এই মন্দির যেন কোনোদিন ভুলে যেতে না দেয়। তাপিত চিত্তে শান্তির আশায় আসা মানুষ এখানে যেন তাঁর জীবনের পরম শান্তি খুঁজে পান। অভুক্ত নিরাশ্রয় মানুষ যেন কয়েকদণ্ডের জন্য হলেও এখানে ঠাঁই পেতে পারেন। এমনকী চূড়ান্ত নাস্তিকও যেন এখানে এসে ঈশ্বর অনুসন্ধানের পথ খুঁজে পান। শুধু জাঁকজমকে, বৃহদায়তনে, নিজের সম্পদের বাহুল্যে, তার গগনচুম্বী রূপে এই মন্দির যেন আমাদের চক্ষু না ভোলায়। পবিত্রতা, অন্তরের প্রশান্তি, ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হৃদয়ের আত্মসমাহিত ভাব, জীবে প্রেম, মন্দির ও তার প্রাঙ্গণ যেন এই সব মহৎ গুণ আমাদের চিত্তে জাগিয়ে তোলে কাল থেকে কালান্তরে। তবেই প্রতিদিন আর অনাগত কালেও অযোধ্যার রামমন্দির হয়ে উঠবে আধুনিক, হয়ে উঠবে আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রমন্দির। ■

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

রামমন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা জাতীয় অস্মিতার পুনর্জাগরণ

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

'রাম, দুই, তিন, চার...' আমার এক কাকা গুনতেন এভাবে। ছেলেবেলায় নানান আয়োজনে ছাত্র গোনা হতো স্কুলে, পাড়ায়, ক্লাবে। যারা 'রাম' দিয়ে গোনা শুরু করতেন, সেখানে 'রাম' হয়ে নিজেকে গোনা হলে ভারী আনন্দ-অনুভূতি হতো। তাই সারির সামনে দাঁড়িয়ে পড়তাম, সেটা যদি শীতকালের স্নানযাত্রা হতো, তবুও। 'রাম' মানে 'এক', এক তখনই বিশাল হয় যখন তা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' রামের নামে উচ্চারিত হয়। ভারতের অনেক লোকায়ত মানুষ সংখ্যা গোনার ক্ষেত্রে 'এক' শব্দ ব্যবহার না করে 'রাম' শব্দটি ব্যবহার করতেন। একের যাবতীয় ক্ষুদ্রতাকে হারিয়ে দেয় 'রাম'। শ্রীরাম একজনই হতে পারেন। রাম মর্যাদাপুরুষোত্তম। শ্রীরামকৃষ্ণ সব সময় ষোলোআনা বা এক টাকার হিসেবে আত্মনিবেদনের কথা বলতেন। এক বা রাম মানে অখণ্ড। রাম মানে পূর্ণ, রাম মানে ঐশী আনন্দরূপের অনবদ্য প্রকাশ।

ভারতের লোকায়ত সংস্কারে যেখানে 'এক' ক্ষুদ্রত্ববাচক শব্দ, নিতান্তই শুরুর কথা, সেই শুরুর মাহাত্ম্যকে মহীয়ান করতে চেয়েছে ভারতবাসী। একলা চলার পথ রমণীয় করে তোলে রামবন্দনা। স্কুলের যে পাহারাদার রামুদা গুনগুন করে শ্রীরামের ভজন করতেন আর রাতের নির্জনতা একলা পায়ে খানখান করে ভেঙে দিয়ে ঊষার আলোয় উদ্ঘোষিত করতেন, 'শোনো ওই রামা হৈ', তাকে টীকাটিপ্পনীতে নাজেহাল করতো সেই সময়ের শাসকদলের ছাত্র-যুবরা। তবুও একক গীত গেয়ে রামনামে মুখরিত করতেন রামুদা। রামনামকে অন্তরে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন মনসেবকরা, তারাও করসেবকের চাইতে কমতি নন। তাদের মনের মধ্যে অহরহ রামশিলা পূর্জিত হতো, তাকে 'ইঁট' আখ্যা দিয়ে কোনো শাসক-মন্ত্রী মন থেকে বার করে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। অনেক ব্যবসায়ী সারাদিনে বারবার হিসেবের কাজে সংখ্যা গোনেন এবং প্রতিবার গোনার ক্ষেত্রে 'রাম' উচ্চারণ করেন। দিনে বহুবার রামনাম করা হয়ে যায় এক সহজ সরল প্রচেষ্টায়। আবার কেউ কারণে-অকারণে 'বাবর' নামটি উচ্চারণ করেন। শঙ্খ ঘোষের নাম স্বভাবত অনেকের মুখে থেকে শোনা যায়। কারণ তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থের নাম 'বাবরের প্রার্থনা'। কেন যে তিনি কাব্যগ্রন্থের নাম দিলেন 'বাবরের প্রার্থনা', শিক্ষকেরা পড়াতে গিয়ে হিমসিম!

অযোধ্যায় হনুমানগড়ি মন্দিরে আরতি করছেন শ্রী মোদী।

হ্যাঁ, তখন একটা সময় ছিল বটে! 'বাবর', 'বাবরি', এইসব নামগুলি খুব প্রচার পেতো! কাব্যে, কথা সাহিত্যে, বক্তৃতায় যে যত মুসলমান আসঙ্গ টানতে পারবেন, তিনি তত নামি সাহিত্যিক, নামি শিক্ষাবিদ, ততটাই সেকুলার। হয়তো সেই সময়ের সাহিত্যিক অবদান 'বাবরের প্রার্থনা'। কাব্যগ্রন্থের জন্য লেখক পেয়ে গেলেন আকাদেমি পুরস্কার। কবি হিসেবে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েও বলছি, নামকরণের মধ্যে যথেষ্ট মুনশিয়ানা ছিল তাঁর। গ্রন্থের 'মণিকর্ণিকা' অংশের একটি কবিতা 'বাবরের প্রার্থনা' এবং তা দিয়েই গ্রন্থের নামকরণ হলো। তাতেই কিস্তিমাত! গ্রন্থের আর কোথাও মুসলমান আসঙ্গ নেই। কবিতাটি শুরু হচ্ছে এইভাবে— ''এই তো জানু পেতে বসেছি পশ্চিম/ আজ বসন্তের রুদ্ধদ্বার'', শুধু এইটুকুই মুসলমান আসঙ্গ। বাকিটা পুরোটাই একজন অসুস্থ সন্তানের জন্য পিতার উদ্বেগ অথবা

অসুস্থ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য পূর্ববর্তী প্রজন্মের আক্ষেপ। বাবরের প্রার্থনার চতুর্থ পঙক্তি হলো ‘‘ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈশ্বর/ আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।’’ কোনো মুসলমান আসঙ্গ যে কবির মনের মধ্যে ছিল না, তা ‘ঈশ্বর’ শব্দটি প্রমাণ করে। এ পর্যন্ত পর্যুদস্ত সন্ততিকে দেখে অসহায় পূর্ববর্তী প্রজন্মই প্রকাশিত শঙ্খ ঘোষে। কিন্তু ছোট্ট, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা কাব্যগ্রন্থটির নামকরণে ব্যাপৃত রইল। কারও কারও মতে বিশেষত ‘বাবর’ নামটিকে ‘এনক্যাশ’ করলেন তিনি। কাব্যগ্রন্থে অন্য উপযুক্ত কবিতাও ছিল— ‘মহানিম গাছ’, ‘হাতেমতাই’ ইত্যাদি। কিন্তু এই নামেই কাব্যগ্রন্থের নামকরণ করলেন, হাতে হাতে পুরস্কার পেলেন! সাতের দশকে জুটল আকাদেমি। কখনও আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, বনফুল সবাইকে অতিক্রম করে গেলেন। কী অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা! তাই না! ‘বাবরের প্রার্থনা’। কবি ঘোষেরও কী পুরস্কার প্রার্থনা?

কাউকে কাউকে বলতে শুনি যথার্থ ‘বুদ্ধিজীবী’ তিনি। অথচ তাঁকে ছাড়তে হয়েছিল বংশানুক্রমিকভাবে পৈতৃক বাড়ি বাংলাদেশের বরিশাল জেলার বানারিপাড়া গ্রামের বাস। বাংলাদেশের বর্তমান চাঁদপুরে জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি, বড়ো হয়েছিলেন পাবনায়। পিতার কর্মস্থল পাবনায় অবস্থান করেছিলেন, সেখান থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছিলেন। তারপর চলে এলেন কেন ভারতে?

অযোধ্যায় তো রামমন্দিরই ছিল আগে। যথাযথ ঐতিহাসিক বিচার করে রামমন্দির করাই বাঞ্ছনীয় এবং তা হয়েছে দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের বিচারে। মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে রাম কে তা বিচার্য নয়। ইতিহাসের বিচার্য সেখানে রামমন্দির ছিল কিনা। খনন কার্যে, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে প্রমাণিত হয়েছে বিতর্কিত কাঠামোর নীচে মন্দির সৌধ ছিল। যে ইতিহাসবেত্তারা গবেষণা শুরুর আগেই তার প্রতিপাদ্য বিষয় বলে দেন বা বলে দিতে পারেন, তাঁরা আর যাই হন, ইতিহাসবেত্তা নন। তাদের গল্পগাছার সম্রাট বলা যেতে পারে বলে তথ্যভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

এবার প্রশ্ন আসবে ‘রাম’ অবতার না মহাপুরুষ? রাম ঐতিহাসিক না পৌরাণিক?

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের পেট্রাপোলে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে অযোধ্যার ভূমিপুজোর প্রসাদ তুলে দেওয়া হলো বাংলাদেশের ওড়াকান্দিধাম থেকে আসা মতুয়া মিশনের মিন্টু বালার হাতে। তুলে দিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পূর্বক্ষেত্রের সম্পাদক অমিয় সরকার ও অন্যান্য কার্যকর্তারা।

খুবই আনন্দের কথা যে, প্রায় পাঁচশো বছর পর অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ হতে চলেছে। এই মন্দির পূর্ণ মনে করা হবে যখন এখানে বাল্মীকিমুনিরও একটি মন্দির তৈরি হবে। ভগবান রাম বাল্মীকি কৃত রামায়ণের মুখ্য চরিত্র। এজন্য তাঁর মন্দিরে বাল্মীকিজীর বিরাজমান থাকা প্রয়োজন।

— মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ শাহ
বিদ্যার্থী
প্রাচীন বাল্মীকি মন্দির, নয়া দিল্লি

'পুরাণ' মানে হলো অতি-প্রত্ন, 'পুরাণ' মানে হলো পুরনো। রাম ঐতিহাসিক নন, প্রাগৈতিহাসিক। প্রাগৈতিহাসিক বিষয় সেটাই, যা ইতিহাসবেত্তাদের আবিষ্কারের পরিসীমার বাইরে। আর্য সভ্যতার (জাতিবাচক নয়, গুণবাচক) অনেক কিছুই প্রতিভাত নয়, কিছু দাপানো ইতিহাসবেত্তাদের জ্ঞানের বাইরে, তার মানে এটা প্রমাণিত হয় না, এটার অস্তিত্ব নেই। কারও জ্ঞানের সীমানার বাইরে তিনি ইতিহাসের নামে জোরজুলুম চালাতে পারেন না। রামায়ণ সম্পর্কে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা আছে বলেই না রবীন্দ্রনাথকে লিখতে হয়, 'কবি, তব মনোভূমি রামের জন্মস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।' যে অযোধ্যায় যুগ যুগ ধরে মানুষ শ্রীরামের নামে পূজন করে এসেছে, যে অযোধ্যার সরযূ নদীতে অবগাহন করাটা পবিত্র কৃত্য বলে মেনে এসেছে, সেখানে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার নামে বিদেশি শাসকের উচিত হয়নি, তা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া। যা হয়েছে তার জন্য দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা না করে বুদ্ধিজীবী তাকে মহিমান্বিত করার অপচেষ্টা করছেন। শ্রীরাম পূজনীয় চরিত্র ছিলেন, তিনি পূজিত হতেন ভারতবাসীর দ্বারা। অযোধ্যায় এমন দেবালয় ছিল। সেজন্যই ওই মন্দিরটি থাকবে। হিন্দুর হাজারো মন্দির লুণ্ঠন হয়েছে, হাজারো দেবালয় ভাঙা হয়েছে, এটা ইতিহাস। মন্দির বদলে অন্য ধর্মের উপাসনালয় হয়েছে।

অনেকে বলেন, ইতিহাস যেটা ঘটে গেছে, সেটা সংরক্ষণ করা উচিত। বিতর্কিত সৌধকে সেজন্যই সংরক্ষিত করা উচিত ছিল। এখন যে কোনো দেশের গৌরবান্বিত অধিবাসী নিজের রাষ্ট্রের গৌরব গাথার কথা বলতে চান, নিজস্ব ঐতিহ্যের অধিকারী বলে নিজেকে বিবেচনা করতে চান, সমস্ত রাষ্ট্রের চাইতে নিজের রাষ্ট্রকে অগ্রগামী করে তুলতে চান, তার মধ্যে স্বাভাবিক মনস্তত্ত্বই প্রকাশিত হয়, এরই নাম স্বদেশী জাগরণ, এরই নাম জাতীয় অস্মিতা। শত শত বছরের ভাঙন ও পীড়নের ইতিহাস কখনও কোনো জাতির অস্মিতা হতে পারে না। ভারতবর্ষের মানুষ চেষ্টা করেছে, ভারতভূমের প্রাচীন ঐতিহ্যকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে। যে জায়গাটা চাপা পড়ে গেছে, তা পুনর্নির্মাণ করতে চেয়েছে, এই স্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব বাধা দেওয়ার নয়, যেখানে আইনি খুঁটিনাটি বিচার করেই দীর্ঘ সময়ের পর একটি রায় এসেছে। কোনো সভ্যতা যদি বারে বারে ধ্বংস হয়, বার বারই আবার গড়ে ওঠে, ঐতিহ্য বার বার ফিরিয়ে আনা হয়, তার মধ্যে অন্যায় কোথায়? রামমন্দির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতবাসী ভারতীয় ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ করেছে। রিফর্মিং বলা যায় একে। এটা ভারতবাসীর দিক থেকে এক স্বাভাবিক মনস্তাত্ত্বিক আচরণ। ভারতবাসী চেষ্টা করবে দেশীয় ঐতিহ্যকে তুলে ধরার। সুপ্রিম কোর্টের অত্যন্ত ভাবনাচিন্তার ফসল রামমন্দির সংক্রান্ত রায়দান। তাছাড়া সমপরিমাণ জমি তো সেখানেই অন্যত্র দেবার কথা বলেছে। পৃথিবীবাসীর কাছে ভারতবাসীর জানানোর বিষয় এটাই। অযোধ্যায় একটি রামমন্দির ছিল, তা ভেঙে ফেলেছিল বিদেশি শাসকের রক্তচক্ষু, আবার তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে, এরমধ্যে গর্হিত অপরাধ কোথায়?

ভারতবাসী তো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মতো ব্রিটিশ সৌধকে ভেঙে কোনো সৌধ নির্মাণ করেনি। এই রকম অনেক ব্রিটিশ সৌধই তো গড়ে উঠেছে। কারণ এই ধরনের সৌধ কোনো হিন্দুধর্মের সৌধকে ভেঙে গুঁড়িয়ে নির্মাণ করা হয়নি। যেখানে যেখানে মন্দির ছিল, সেখানে সেখানে তা গুঁড়িয়ে মসজিদ তোলা কী গর্হিত কাজ নয়? নিশ্চয়ই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আপন ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। কিন্তু কখনোই শাসক অস্ত্রের জোরে শাসিতের ঐতিহ্য ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারেন না। মনে রাখতে হবে, 'পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।' কোনো বিদেশি শাসক যদি আগ্রাসন করে থাকেন, তবে পরবর্তী মানুষ তা সংশোধন করতে পারবেন না কেন? ইতিহাসের ভুলের কী সংশোধন হবে না? দেশবাসীর অপমানের জায়গাটার প্রতিশোধ এবং প্রতিকারের জায়গাটি হলো রামমন্দিরের পুনর্নির্মাণ। তখনকার অপমানিত মানুষ যা করতে পারেননি, চুপ করে মুখ বুজে থাকতে বাধ্য ছিলেন, আজকে তা আইন মেনে করাতে পারলেন। রামমন্দিরের ভূমিপূজন তাই দেশবাসীর দ্বিতীয় স্বাধীনতা দিবস।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

অযোধ্যায় রামশিলা (ইঁট) পূজা করছেন অযোধ্যা আন্দোলনের অন্যতম মহন্ত পরমহংস রামচন্দ্র দাস। সঙ্গে রয়েছেন অশোক সিংঘল (১৯৮৮)।

রামমন্দিরের শিলান্যাস

ভারতীয় নবজাগরণের সূচনারই প্রকাশ

ড. তুষার কান্তি ঘোষ

'শ্রীরাম' ভারতের মানুষের হৃদয় উদ্বেলিত একটি নাম। এই 'নাম' জন্ম-জন্মান্তরের কালপ্রবাহকে অতিক্রম করে বয়ে চলা এক জীবনবোধ। জন্ম-মৃত্যুরহিত এক ব্রহ্মশক্তি রামচন্দ্রের রূপ ধরে কেবলমাত্র জীবের কল্যাণের জন্য এই মর্ত্য পৃথিবীতে এসেছিলেন। বিশ্বকবি অসাধারণ কথাকে সহজ ভাবে বলেছেন, ''বাল্মীকির রামচরিত কথাকে পাঠকগণ কেবলমাত্র কবির কাব্য বলিয়া দেখিবেন না তাহাকে ভারতবর্ষের দ্বারা ভারতবর্ষকে ও ভারতবর্ষের দ্বারা রামায়ণকে যথার্থ ভাবে বুঝিতে পারিবেন। পরিপূর্ণ মানবের আদর্শ চরিত্র ভারতবর্ষ শুনিতে চাহিয়াছিল এবং আজ পর্যন্ত তাহা অশ্রান্ত আনন্দের সহিত শুনিয়া আসিতেছে। একথা বলে নাই যে, বড়ো বাড়াবাড়ি হইতেছে, একথা বলে নাই যে, এ কেবল কাব্যকথা মাত্র। ভারতবাসীর ঘরের লোক এত সত্য নহে— রাম লক্ষ্মণ সীতা তাদের পক্ষে যত সত্য।''

শ্রীরামচন্দ্রের কঠোর আত্মত্যাগ এবং সংগঠন কুশলতা ভারতবর্ষের দুটো যুগের— ত্রেতা, দ্বাপর— মধ্যে এক বিশিষ্ট ইতিহাস ধারার প্রকৃতি লক্ষ্য করেছেন বিশ্ববাসী। সীতা হরণের পর এক অচেনা অজানা দেশকে জানতে পেরে নারীত্বের মূল্য প্রতিষ্ঠা ও বলদর্পী রাবণের স্বর্ণ সভ্যতার অহংকারকে বিধ্বস্ত করেছিলেন শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ, শুধুমাত্র অরণ্যবাসী বানর সদৃশ মনুষ্যকুলের সাহায্যে। এই অরণ্যবাসী খুবই পণ্ডিত ছিলেন না, তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন না, তবুও তাঁরা দুর্ধর্ষ রাবণের সাম্রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। হাতে তেমন অস্ত্র ছিল না, এমনকী গাছের ডাল নিয়ে তারা সমুদ্র পার হয়ে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। 'বন বন মে ভটকনে'-বালা রাম এই সৈন্যদের একটি পয়সাও দিতে পারেননি যুদ্ধের সৈনিক হিসেবে। এই সৈন্যদের কণ্ঠে ছিল শ্রীরামের হর্ষধ্বনি আর সীতামাতাকে যে রাবণ হরণ করেছে তাকে হত্যার সংকল্প।

এর পরেই ভারতবর্ষ কেমন পালটে গেল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্ম দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কর্ণের মতো বীর তত্ত্বজ্ঞানী বিদ্যাবিশারদের সামনে প্রকাশ্য রাজসভায় কুলবধূ দ্রৌপদীর চরম লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করেছিলেন। এরাই আবার 'রাবণ'কে সমর্থন করে যুদ্ধ করলেন ন্যায় ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা পাণ্ডবদের বিপক্ষে, এমনকী পরম প্রেমময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরোধিতা করেও। কোটি কোটি সুবর্ণমুদ্রা যুদ্ধাগ্নিতে ভস্মীভূত হলো, কোটি কোটি রাজসৈন্য-সহ রথী- মহারথীরা নিহত হলেন। এই

অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের উদ্দেশে লালকৃষ্ণ আদবানির নেতৃত্বে সোমনাথ থেকে অযোধ্যা রথযাত্রা। সঙ্গে রয়েছেন নরেন্দ্র মোদী।

অন্যায়বোধ, রামচন্দ্রের পর একটি যুগ বিবর্তনে এমন নৈরাজ্য, এমন হিংস্র পাশবিকতা, ভারতবর্ষকে গ্রাস করল কীভাবে? এই তত্ত্বজ্ঞানীরা কী মনুষ্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ জীবনবোধের গ্রন্থ রামায়ণের একবারও একটি পাতাও উলটে দেখেননি। জানতেন না? যে রামচন্দ্র সর্বজীবের সর্বকালের আদর্শপুরুষ। প্রেরণা পুরুষ। ধর্মই তাঁর বীরত্বের প্রকাশ।

তাই রামায়ণের রামরাজত্ব এক প্রাণবন্ত রাজ্য পরিচালনার ধারার প্রতীক। এতে সর্বকুলের সমৃদ্ধি। সকলের শান্তি। সকল প্রজারই আধ্যাত্মিক উন্নতি। রামায়ণে কৃষিক্ষেত্রগুলোর এমন সুন্দর বর্ণনা— এ যেন মনুষ্যকুলের আর্থিক উন্নতির সোপান। দেশ রক্ষার্থে শ্রীরামের প্রত্যক্ষযুদ্ধ অসুর ও রাক্ষসকুলের সঙ্গে, সামাজিক সুরক্ষার বিশিষ্ট ঘটনা— রাজাই প্রজাগণের রক্ষার প্রত্যক্ষ অধিকারী— আমলাতন্ত্র নয়।

পূর্ণ ব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র আদর্শ পুত্র, আদর্শপতি, আদর্শ নৃপতি; তিনিই হিন্দুদের প্রাণপুরুষ পরমারাধ্য দেবতা। পবিত্র নিষ্ঠাবোধই শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি অযোধ্যাকে করেছে পুণ্যতীর্থ, ভক্তজনের পরম পবিত্র দর্শনীয় স্থান রূপে।

২

ভারতের পল্লীতে পল্লীতে গাওয়া রামায়ণ কাহিনির রামকে পৃথিবীর আপামর দেশ কীভাবে নিজের জীবনাদর্শরূপে গ্রহণ করল— তাতে বিস্মিত হতে হয়। সমগ্র পৃথিবী চেয়েছিল শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সীতার মতো আদর্শ মানব-মানবী তাদেরও ঘরে জন্মগ্রহণ করুক। এই পৃথিবীতে পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম, পতি-পত্নীর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, মাতৃভক্তি, বন্ধুত্বের সর্বোচ্চ নিদর্শন, দেশপ্রেম, প্রজার প্রতি রাজার বাৎসল্য— যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন দেশকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাই আজও রাশিয়াতে পাওয়া গিয়েছে রামচন্দ্রের জীবন অনুসারে বহু ভাস্কর্য ও চিত্র। রাম-রাবণের যুদ্ধের চিত্র যা আজও লেলিন গ্রাডের ইনস্টিটিউট অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ অব ইউএসএসআর অ্যাকাডেমি অব সাইন্সেস-এ রাখা আছে (সূত্র : The Image of India– Progress Publishers, Moscow)। রাশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন রামায়ণ অন্তর্ভুক্ত করা হলো সেদিন ক্রুশ্চেভকে প্রশ্ন করা হলে ক্রুশ্চেভ বলেছিলেন রাশিয়ায় রাম-লক্ষ্মণের মতো ভাই, সীতার মতো পত্নী পাওয়া গেলে দেশের জীবন ধারায় উন্নতি ঘটবে।

রামায়ণে বীর সুগ্রীব সীতার খোঁজে তাঁর অনুগামীদের যবদ্বীপে পাঠিয়েছিলেন। এই যবদ্বীপের বর্তমান নাম জাভা, সুমাত্রা ও বালি। সুমাত্রা, জাভা ও বালিতে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি নিয়েই তাদের শিক্ষাদর্শন। বালিতে সংস্কৃতিক জীবন 'রামায়ণ' ময়। পুতুলনাচ থেকে মানবীয় নৃত্যতে ঋংকৃত বালির সভ্যতা। তাদের বাড়িগুলো মন্দিরের মতো। রাস্তায় রাস্তায় দেখা যায় শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে সাংস্কৃতিক জীবনের বহমান ধারাই বলো রামায়ণ। মঞ্চে অভিনীত সীতা, রাম-লক্ষ্মণ, রাবণ, শিব-দুর্গার অভিনয়ে জীবন্ত ভারত প্রকাশিত হয়ে উঠে ইন্দোনেশিয়া থেকে থাইল্যান্ড, শ্যাম-কম্বোজ থেকে যবদ্বীপে।

এই দেশগুলোর অনেকে ইসলামকে গ্রহণ করেছে কিন্তু শ্রীরামকে ক্ষণিকের তরেও ছাড়েনি। রামায়ণ কাহিনির এই নৃত্যগুলোর নাম— সেমারায়ানা নৃত্য, তোপেং নৃত্য, তৃণা-জয়া নৃত্য, যুডাপতি (যুদ্ধাপতি) নৃত্য, ওয়ালি নৃত্য, চন্দ্রাংশী নৃত্য ইত্যাদি। আজও বালির উবুদে ও ডেনপাসারে রাজপ্রসাদের সামনে সন্ধ্যায় রামায়ণ নৃত্যানুষ্ঠান হয়। এই দ্বীপময় দেশে অজস্র ভ্রমণকারী যখন বিদেশ থেকে আসছেন তখন তাঁরা রামায়ণ সংস্কৃতি দেখে মুগ্ধ হয়ে নিয়ে চলেছেন ভারতীয় সভ্যতা, হিন্দু শিল্প-সাহিত্যের অমর বার্তার বাণীবদ্ধ রূপ।

শিকাগোর 'Field Museum of National History'-তে সংরক্ষিত আছে রামায়ণে বর্ণিত বিভিন্ন ভাস্কর্য মূর্তি। বিশিষ্ট গবেষক জুয়ান আর ফ্রান্সিসকো ফিলিপাইন্সের মুসলমান মারানাও বাসিন্দাদের মধ্যে বহুকাল ধরে একটা রামায়ণ প্রচারিত হওয়ার কথা বলেছেন। এই ফিলিপাইনের অবতার বলে শ্রীরাম আজও পূজিত। 'রামা হরি' মঞ্চে অ্যালিস রেইস নামে এক কোরিও গ্রাফারের পরিচালনায় মুসলমান যুবক যুবতীদের অংশগ্রহণে রামায়ণের ব্যালে নৃত্য আজও আকর্ষণীয়। তারাও জগতের বিভিন্ন দেশে পৌঁছে দিচ্ছেন রামায়ণের জীবনবোধ।

চীনে 'রামকথা' কী ব্যাপকভাবে প্রচলিত তার বিবরণ দিয়েছেন W.H.D. Rouse (Cambridge 1901) কত দেশে এই ভাবে জনজীবনে প্রকাশিত আছে শ্রীরামের মহান জীবনের কাহিনি।

ছদ্মবেশে অযোধ্যা করসেবকদের মাঝে অশোক সিংহল (১৯৮৯)।

৩

বাল্মীকি-রামায়ণের পুরুষোত্তম নায়ক দশরথি রাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন অযোধ্যায়। কোশল রাজ্যের রাজধানী ছিল অযোধ্যা। যুগ যুগ ধরে এই অযোধ্যায় বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামের জন্মস্থানে ভক্তিভরে পূজা-অর্চনা ও শ্রদ্ধা-প্রার্থনা নিবেদন করে আসছেন আপামর হিন্দুসমাজ। তখন ইসলামের আবির্ভাবও হয়নি সমগ্র বিশ্বে।

প্রাচীনকাল থেকেই অযোধ্যার বিবরণ দেওয়া আছে প্রাচীন গ্রন্থগুলোতে।

অষ্টাচক্র নবদ্বারা দেবানাং পুরাযোধ্যা।
তস্মত্রং হিরণীয়ঃ কোন স্বর্গৌ জ্যোতিষাবৃত।।

অথর্ববেদ : ১০।২।৩১

মূলাধার, নবদ্বারা অষ্টচক্র-সহ অযোধ্যাপুরীর ভিতর স্বর্ণময়। অযোধ্যাকে ব্রহ্মময়ী বৈকুণ্ঠধাম বলে অভিহিত করা হয়েছে। অযোধ্যা কালের বিবর্তনে ও প্রশাসনিক ব্যবহারে শ্রীরামচন্দ্রের প্রাসাদ নিহিত ও সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। প্রতি কার্তিক মাসে অজস্র হিন্দু জণগণ চোদ্দক্রোশী ও পঞ্চদ্রোশী পরিক্রমায় অযোধ্যাকে পরিক্রমণ করেন। কার্তিক পূর্ণিমায় এই পরিক্রমণের অর্থ শ্রীরামের জন্মভূমি অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ ছিল চৌদ্দ ক্রোশ লম্বা ও পঞ্চ ক্রোশ চওড়া। অযোধ্যার রামকোটে রামচন্দ্র একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। দুর্গের চারিদিকে কুড়িটি বুরুজ ছিল, যার উপর উঠে সুগ্রীব, হনুমান, জাম্বুমান প্রভৃতি বীরেরা নগর রক্ষা করতেন। দুর্গের মধ্যে ৮টি রাজপ্রাসাদ ছিল।

সরযূর তীরে এই নগরী ধনসম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। অত্যন্ত সুদৃশ্য এই নগর। কুসুম বৃক্ষে সজ্জিত এর রাজপথগুলো নগরীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করত। অসংখ্য তোরণ দ্বারা নগরীতে প্রবেশ করা যেত। নগরীর চারিপাশে ছিল পরিখা। অযোধ্যা সুউচ্চ নগরী ছিল যার জন্য এখানে প্রবেশ করে কেউ যোধ্যার ভূমিকা গ্রহণ করতে পারত না, তাই এই নগরী ছিল অযোধ্যা। দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞের সময় সমগ্র ভারতবর্ষের রাজারা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেই বর্ণাঢ্য রূপের কথা কাল্মীকি দিয়েছেন।

রামচন্দ্রের তিরোধানের পর এই নগরীতে এই রামচন্দ্রের এক ভব্য মন্দির নির্মিত হয়। এই মন্দির বিষ্ণু হরি মন্দির নামেও পরিচিত ছিল।

বিশিষ্ট গবেষক ড. পি.ডি. বর্তক তিনি রামায়ণের উপর দীর্ঘকাল গবেষণা করেন। তাঁর মতে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন খ্রিস্টপূর্ব ৭৩২৩-এর ৪ ডিসেম্বর মঙ্গলবার। তিনি বনবাসে যান বৃহস্পতি, ২৯ নভেম্বর ৭৩০৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এর ঠিক ছয়দিন পর অর্থাৎ ৫ ডিসেম্বর বুধবার দশরথ দেহত্যাগ করেন। রাবণের মৃত্যু হয়েছিল ১৫ নভেম্বর, রবিবার ৭২৮২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। রামচন্দ্র ৬ ডিসেম্বর অযোধ্যায় পুষ্পক

রামমন্দিরের করসেবায় যোগ দিয়ে পুলিশের গুলিতে শহিদ হয়েছেন কলকাতার দুই ভাই রাম কোঠারি ও শরদ কোঠারি (১৯৮৯)।

রথে ফিরে আসেন।

সীতার গৃহাঙ্গণে প্রবেশ ঘটেছিল কুশের ১২ বছর বয়সে। এর পরেই কুশলবের সিংহাসন অভিষেক, ভাইদের পুত্রদের বিভিন্ন রাজ্যে অভিষেকের পর শ্রীরামচন্দ্র সরযূতে বহুজন সমেত সলিল সমাধি গ্রহণ করে স্বর্গারোহণ করেন। এই সব ঘটনার কাল প্রবাহ প্রায় ৩৫ বছর। অর্থাৎ রামচন্দ্রের প্রয়াণকাল ৭২৬৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ অযোধ্যায় রামমন্দির হয় এর পরবর্তী কালেই। শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি মন্দিরের সংস্কার কাহিনিও বিশিষ্টতায় পূর্ণ। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে রামচন্দ্রের রাজত্বের দীর্ঘকাল পর রাজা ঋষভ অযোধ্যায় রাজত্ব করেছিলেন। মহাভারতের যুদ্ধের পূর্বেই ঋষভের রাজত্বকাল চলেছিল বলে মনে করা হয়। তাঁর শাসনকালে অযোধ্যা নগরী আবার আলোয় আলোকিত হয়ে উঠে। ঋষভ রামমন্দিরে লক্ষ্মণ হনুমান প্রভৃতি মূর্তি স্থাপন করেন।

মহাভারতের যুদ্ধের পর ভারতবর্ষ নৃপতিহীন, শ্রীহীন হয়ে পড়ে। এই সময়কালে রাজা পরীক্ষিৎ অযোধ্যার দেখভাল করতেন। পরে যুগের প্রবাহে অযোধ্যা জঙ্গলে অকীর্ণ হয়ে পড়ে। অযোধ্যার সৌন্দর্য প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে সাতবাহনদের নরপতি বিক্রমাদিত্য উপাধিধারী এক সম্রাট প্রায় ৫৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অযোধ্যা নগরীর সংস্কার সাধন করেন। রামজন্মভূমি মন্দিরের পুনঃসংস্কার করেন। শুধু তাই নয় তিনি অযোধ্যাতে শ্রীরামচন্দ্রের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলিকে আকর্ষণীয় করে অযোধ্যার শ্রীবৃদ্ধি করেন। মন্দিরে তিনি সীতা-রামের মূর্তি স্থাপন করেন।

বিক্রমাদিত্য পুষ্যমিত্র পুনরায় অযোধ্যায় জনজীবনকে সমৃদ্ধশালী করেন। রামচন্দ্রের অযোধ্যাকে তিনি দ্যুতিময় করে তোলেন। তিনি তাঁর রাজধানীও অযোধ্যায় প্রতিষ্ঠিত করেন। হরপ্রসাদ রায়ের মতে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে পরবর্তীকালে অযোধ্যা নগরীকে আগের মতো নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করতে হয়নি। গুপ্ত রাজত্বকালে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময় অযোধ্যা পুনরায় সংস্কারিত হয়। একটি সংস্কৃতের লিপি অনুসারে ২৪৩১ যুধিষ্ঠির সংবতের পৌষ মাসের দ্বিতীয় অমাবস্যায় রাজা বিক্রমাদিত্য রামের মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করে রামসীতার বিগ্রহ স্থাপন করেন। (District Gazeetler Faizabad, 1960, p. 353)। রাজা বিক্রমাদিত্য অযোধ্যায় খনন কার্য শুরু করেন এবং রামচন্দ্রের রাজপুরীর সন্ধান পান। ক্রমে ক্রমে দশরথের চারপুত্র ও হনুমানের মূর্তি ঘোদিত ছিল। তিনি রামচন্দ্রের জন্মস্থান ও রাজপুরী সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন। এছাড়া তিনি অযোধ্যাকে গরিমাময় করে তোলার জন্য বহু মন্দির নির্মাণ করেন। এই মন্দিরগুলির সংখ্যা প্রায় ৩৬০।

স্তম্ভে যে মূর্তিগুলো আছে এই মূর্তি স্মৃতি শাস্ত্র অনুসারে শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যানমূর্তি —অভিমত হরপ্রসাদ রায়ের। একটি ধ্যানের স্বরূপ—

'অযোধ্যা নগরে রম্যে রত্ন সৌবর্ণ মণ্ডপে।
মন্দার পুষ্পৈরাবদ্ধ বিতানে তোরাম্বিতে
সিংহাসন সমারাঢং পুষ্পাকোপরি রাঘবম।'

পরবর্তীকালে দীর্ঘ বছর ধরে গাড়োয়ালের নৃরতিরা অযোধ্যায় শ্রীরামপুরীও রামচন্দ্রের সংস্কার সাধন করে এসেছিলেন।

৫

ভারতবর্ষের এই ঐতিহ্যশালী মন্দিরকে বাবরের অযোধ্যা অবস্থাকালে ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সেনাপতি মীর বাকী এই মন্দির ধ্বংস করে একে মসজিদে পরিণত করলেন। এর প্রচলিত নাম দিলেন বাবরী মসজিদ। "Mir Baqi of Tashkrint Perhaps a better epithet for saadat–nishan than 'good hearted' would be one implying his good fortune in being designated to build a mosque on the site of the ancient Hindutemple." (Babur-Nama Tr. by A.S. Beveridage, D.K. Publishers and Distributor P. Ltd. Delhi-52 1995, in the Chapter-U-'The inscriptions on Babur's Mosque in Ajodhya (Oudh) - Page-xxvii')।

ভারতবর্ষ রামচন্দ্রের এই ঐতিহ্যময় মন্দিরের বিলোপ সাধন মেনে নেয়নি। এই সময় ভীষণ যুদ্ধে প্রায় ১.৭৪ লক্ষ মানুষ প্রাণ বলিদান করেন। পরবর্তীতে মোগল আমলে মন্দির উদ্ধারের চেষ্টা হয় স্বামী মহেশ্বরানন্দের নেতৃত্বে। সংগ্রামীদের শপথ ছিল— 'জন্মভূমি উদ্ধার করে যা দিন বৈরীভাগ ছাতাপগ পনহী ঔর ন বাঁধাই পাগ— যতদিন না শত্রুজয় করে আমরা রামমন্দির মুক্ত করতে পারি ততদিন মাথায় ছাতা দেব না, জুতা পরব না পাগড়িও বাঁধব না। এমনকী হিন্দু মেয়েরা দল বেঁধে পুজো দিয়ে যেত ও তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হতো 'জয়শ্রীরাম— ন বাঁধা পাগ'। হুমায়ুনের রাজত্বকালের ইতিহাসে এই মন্দির দখল ও পুনর্দখলের। আকবর তো সংগ্রামীদের সন্তুষ্ট করতে রাম-সীতার মূর্তিখোদিত রৌপ্য মুদ্রা চালু করেন। নিকোশো কান্তি ও ধ্বংসপ্রাপ্ত অযোধ্যায় দেবালয়ে হিন্দুদের পুজো অর্চনার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। ইংরেজ আমলেও জন্মস্থান আখড়ার মোহন্ত রামকিশোর দাসের নেতৃত্বে লড়াই চলে। এই নিয়ে মামলা হলেও ১৮৮৫-তে বলা হলো— "The place where the Hindus worship is in their possession from old and their owner she cannot be questioned." এই মন্দির নিয়ে এত লড়াই কেন? হিন্দুদের বহু মন্দির ভেঙে এখনও মসজিদ অবস্থায় আছে, সেখানে এত সংঘর্ষ হয়নি। তার কারণ ভারতবর্ষের হিন্দুদের অস্মিতার প্রশ্ন স্বয়ং রামচন্দ্রের জন্মস্থানের মন্দিরের উপর। কারও অধিকার মানব না এই স্থানে।

৬

রেনেসাঁসের অর্থ পুনর্জন্ম। এত সংঘর্ষের পর রাম জন্মভূমি রামমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলো। এ শুধু জয় নয়— এই মন্দির হিন্দুদের আত্মবিশ্বাস ও গৌরবের প্রতীক। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতে রামায়ণের মহত্ত্ব বিশাল। রামায়ণই যে যুগে যুগে ভারতীয় চিত্ত ও চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত ও রূপদান করেছে তা নয়, ভারতীয় চিত্ত কালে কালে নিজের প্রয়োজন মতো রামায়ণকে নব নব রূপে গড়ে নিয়েছে। এই সত্যের ধারা সুদূর প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাহিত হয়ে এসেছে এবং পূত সলিলা গঙ্গার স্রোতের মতোই ভারতীয় চিত্ত ভূমিকে চির শ্যামল করে রেখেছে। শ্রীরামচন্দ্রের জীবন কাহিনির এই উপাখ্যানই ভারতীয় রেনেসাঁস— ভারতের অস্মিতার নবজন্ম। কারণ মন্দিরের অধিকার আজ ফিরে এসেছে। ■

অযোধ্যায় শ্রীরামমন্দিরের শিলান্যাসের মুহূর্তে দেশজুড়ে খুশির জোয়ার।

বনবাসী ভারতের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন

সন্দীপ চক্রবর্তী

পিতৃসত্য পালনে শ্রীরাম চোদ্দ বছরের জন্য বনে গিয়েছিলেন। তারপর সম্মুখ যুদ্ধে রাবণকে বধ করে পত্নী সীতা এবং সহোদর লক্ষ্মণ-সহ অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন। সেইসময় বা তার পরবর্তীকালে সহস্রাধিক বছর পর্যন্ত কেউ ভাবতে পারেনি এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আরও একবার ঘটতে পারে। কিন্তু এমন একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছিল। এবং এমনভাবে ঘটেছিল যাতে কোনও ব্যক্তিবিশেষ নন, একটি দেশ বা আরও স্পষ্ট করে বললে সমগ্র একটি জাতি বনবাসে গমন করতে বাধ্য হয়। দেশটির নাম ভারতবর্ষ। আর জাতির নাম হিন্দু। মধ্য এশিয়া থেকে এসে বাবর নামের এক লুটেরা হিন্দুদের বাধ্য করেছিল নিজভূমে পরবাসী হয়ে থাকতে। এই পরবাস ছিল বনবাসেরই নামান্তর। গত ৫ আগস্ট অযোধ্যায় রামমন্দিরের ভূমিপূজনের মাধ্যমে শেষ হলো ভারতবর্ষের পাঁচ শতাব্দীর বনবাস। বনবাসী ভারত ফিরে পেল তার দেশ। তার স্বাভিমান। হাজার বছরের ইসলামিক শাসন, দু'শো বছরের ব্রিটিশ শাসন এবং সত্তর বছরের ব্রিটিশ মডেলের দেশীয় শাসনের নৈরাজ্য পেরিয়ে ভারতবর্ষ স্বাদ নিল তার নিজস্ব জাতিসত্তার।

প্রশ্ন উঠবে, ভারতীয় জাতিসত্তার সঙ্গে রামমন্দিরের ভূমিপূজনের কী সম্পর্ক? এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে আমাদের বুঝে নিতে হবে রাষ্ট্র এবং দেশের পার্থক্যটি। যে কোনও ভূখণ্ডকেই সেখানকার অধিবাসীদের দেশ বলা যেতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র বলা চলে না। একটি রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অস্তিত্ব তো থাকতেই হবে। সেইসঙ্গে থাকতে হবে একটি প্রাচীন সংস্কৃতিসম্পন্ন পরম্পরা। থাকতে হবে তার নিজস্ব অস্মিতা। অর্থাৎ জ্ঞান এবং সংস্কৃতি, ইতিহাসও। এই অর্থে ভারত একটি রাষ্ট্র। কিন্তু পাকিস্তান নয়। কারণ পাকিস্তানের যে অস্মিতা তা মূলত ভারতেরই। নিজস্ব জ্ঞান এবং সংস্কৃতিতে ঋদ্ধ মানবগোষ্ঠীই কালক্রমে জাতি হিসেবে পরিগণিত হয়। তাই যে-অর্থে জার্মান, ফরাসি, ব্রিটিশরা একেকটি জাতি, সেই একই অর্থে হিন্দুরাও একটি জাতি। নিজস্ব জাতিসত্তার অধিকারী। পার্থক্য শুধু একটি জায়গায়। বিশ্বের প্রতিটি জাতির এক বা একাধিক জাতীয় নায়ক থাকেন। যারা তাদের চরিত্র দিয়ে, আদর্শ দিয়ে সমগ্র জাতিকে একসূত্রে বেঁধে রাখেন। একটি জাতির জীবনবোধ কিংবা মানসিক গঠন কেমন হবে তার অনেকখানি পরিচয় পাওয়া যায় তাদের জাতীয় নায়কের জীবন বিশ্লেষণ করলে। উদাহরণস্বরূপ, মাওকে যদি চীনের জাতীয় নায়ক

হিসেবে গ্রহণ করি তা হলে আজকের চীনের নৃশংস এবং অত্যাচারী কার্যকলাপের কারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না। যাই হোক, মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাই। ভারতীয়দের জাতীয় নায়কের জায়গায় বহু প্রাচীন কাল থেকেই শ্রীরামের অবস্থান। কারণ তিনি আনুমানিক সতেরো হাজার বছর আগে নানান জাতি-উপজাতিতে বিভক্ত ভারতীয়দের এক ছাতার নীচে এনেছিলেন। উদ্দেশ্য, দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন। আমাদের মনে রাখতে হবে, সেযুগে রাবণ ছিলেন প্রবল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। সন্ত্রাসবাদী শক্তিও বলা যেতে পারে। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারত রাবণের ভয়ে কাঁপত। সীতা-উদ্ধার উপলক্ষ্যে শ্রীরাম প্রবল পরাক্রমী রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। এবং রাবণকে বধ করে দক্ষিণ ভারতের একাধিক জনপদকে রাবণের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু এটুকুই কি জাতীয় নায়ক হবার জন্য যথেষ্ট? না। অযোধ্যায় ফিরে তিনি রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং স্থাপন করেছিলেন প্রজাকল্যাণের অনুপম দৃষ্টান্তসমূহ। আজও আদর্শ রাষ্ট্রের উদাহরণ দেবার সময় রামরাজ্যের কথা বলা হয়। পুত্র, স্বামী, ভ্রাতা, পিতা ও সম্রাট-পরিবার ও রাষ্ট্রের প্রতিটি ভূমিকাতেই তিনি আদর্শ, মর্যাদাপুরুষোত্তম। ভারতবর্ষের জাতীয় নায়ক। এ দেশে মুঘল সলতনত্

রামমন্দির নির্মাণের পর বদলে যাবে ভারতের রাজনীতি। সেই বদলে যাওয়া রাজনীতিতে রাষ্ট্রবিরোধীদের টিকে থাকা শুধু কষ্টকরই নয়, প্রায় অসম্ভব। কারণ দেশবিরোধিতা না থাকলে তাঁদের রাজনীতি শূন্যগর্ভ হয়ে উঠতে বাধ্য।

কায়েম করেই বাবর শ্রীরামের সর্বময় উপস্থিতি টের পেয়েছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন হিন্দুদের জাতিসত্তার মেরুদণ্ডটি ভাঙতে হলে আগে শ্রীরামের ভাবমূর্তিটি নষ্ট করতে হবে। নয়তো হিন্দুস্থানকে গোলাম বানানো যাবে না এবং সেইজন্য বেছে নিয়েছিলেন অযোধ্যাকে। অযোধ্যা শ্রীরামের জন্মস্থান। যে রামায়ণী ভাবধারায় আপামর ভারতবাসী শ্বাস-প্রশ্বাস নেয় তার কেন্দ্রবিন্দু হল এই অযোধ্যা। এই শহরের সুমহান মর্যাদা যদি মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া যায় তা হলে হিন্দুরা কোনওদিনই বিদেশি শাসকের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। সুদীর্ঘকাল ধরে মুঘল সাম্রাজ্যের গোলামি করতে বাধ্য হবে। ঠিক এই উদ্দেশ্যেই বাবর অযোধ্যার রাম জন্মস্থান মন্দির ধ্বংস করে সেই জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করান। এই একই কারণে মথুরার কৃষ্ণমন্দির এবং গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরও বারবার আক্রান্ত হয়েছে। বারাণসীর বিশ্বনাথ মন্দিরের চৌহদ্দির মধ্যে তৈরি করা হয়েছে মসজিদ। সুতরাং ৫ আগস্টকে শুধুমাত্র রামমন্দিরের ভূমিপূজনের দিন বললে

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোদীকে শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি প্রদান করছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

ভুল হবে, বিলুপ্তপ্রায় ভারতীয় জাতিসত্তার পুনরুত্থানের দিন হিসেবেও এই দিন পরবর্তীকালে মান্যতা পাবে।

ভারতীয় জাতিসত্তার ভিতটি যে এখনও বেশ দুর্বল এবং নানাভাবে বিভক্ত তা টের পাওয়া যায় ভূমিপূজনের দিন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, নেতৃবৃন্দ এবং মিডিয়ার একাংশের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলে। আসাদুদ্দিন ওয়েসির বক্তব্য ঃ ৫ আগস্ট অযোধ্যায় রামমন্দিরের ভূমিপূজনের জন্য ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ লঙ্ঘিত হয়েছে। এবং ভূমিপূজনে পৌরোহিত্য করে শ্রীনরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নেওয়া তাঁর শপথ ভঙ্গ করেছেন। ওয়েসি সাহেবের কথা শুনলে সত্যিই আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, ধর্ম ও মজহবের পার্থক্য না বুঝে এই ধরনের বালখিল্য মন্তব্য আপনি করেন কোন সাহসে? হিন্দু ধর্ম ইসলামের মতো নিছক একটি উপাসনা পদ্ধতি নয়। কোনও হিন্দু ধর্মগ্রন্থে ঈশ্বর ভজনাকে গুরুত্বহীন করে দিয়ে কত ইঞ্চি চুল-দাড়ি রাখতে হবে তার লম্বা ফিরিস্তি দেওয়া হয়নি। যজমানের পাজামার ঝুলও মাপেন না হিন্দু মন্দিরের কোনও পুরোহিত। হিন্দুদের কাছে ধর্ম হলো জীবনবোধ এবং বিশ্ববোধ। এই দুই বোধের প্রসারে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তারাই হিন্দুদের দেবী ও দেবতা। এরা প্রত্যেকেই জন্মসূত্রে মানুষ কিন্তু গুণকর্মে দেবতা। এদের কাছে যা সত্য তাই ধর্ম। শ্রীরাম সারাজীবন সত্যের পথ অনুসরণ করেছেন। তাঁর জীবনযাপন তাঁকে মানুষের কাছে প্রিয় করে তুলেছে। আর প্রিয় হয়েছেন বলেই দেবতা হয়েছেন। এবার আপনি বলুন ওয়েসি সাহেব, এমন একজন মানুষের মন্দির তৈরি হলে ধর্মনিরপেক্ষতা কীভাবে লঙ্ঘিত হয়? বাকি রইল শ্রীনরেন্দ্র মোদীর শপথ ভঙ্গের প্রশ্ন। বলা বাহুল্য এই প্রশ্নটিও বালখিল্যপনায় আক্রান্ত। অন্তত আজকের ভারতবর্ষের বিরোধী রাজনীতিতে মুসলমান-তোষণের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে একথা মনে হবেই। প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় মনমোহন সিংহ যখন ইফতার পার্টিতে মাথায় ফেজ টুপি পরে বসে থাকতেন তখন তো আপনি শপথ ভঙ্গ করার অভিযোগ করেননি। পশ্চিমবঙ্গের

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মাথায় হিজাব পরে নামাজ পড়েন তখনও তো কিছু বলেন না। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী যখন খ্রিস্টান লবির চাপে হিন্দু মন্দিরের ভূসম্পত্তি ষড়যন্ত্র করে হাতিয়ে নেবার পরিকল্পনা করেন তখন কেন মুখ খোলেন না ওয়েসি সাহেব? প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে কোনও বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করার শপথ কি নরেন্দ্র মোদী একা নিয়েছেন?

ভূমিপূজনের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ, করোনা মহামারীর প্রকোপে দেশের অর্থনীতি যখন বিপর্যস্ত তখন কেন এই সময় কোটি কোটি টাকা খরচ করে মন্দির নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো? এই অভিযোগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে আরও একটি ভুল তথ্য। বলা হচ্ছে মন্দির নির্মাণের খরচ নাকি কেন্দ্রীয় সরকার ব্যয় করবে। ভারতবর্ষের সৌভাগ্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী নন। যদি হতেন তা হলে রামমন্দির নির্মাণে কেন্দ্র টাকা না জোগালেও সারা দেশে সরকারি খরচে দশ-বিশটা হজ হাউস বানিয়ে দিত। ঠিক যেরকম মাননীয়া পশ্চিমবঙ্গে বানিয়েছেন। যাই হোক, অভিযোগের উত্তরে বলা যেতে পারে রামমন্দির নির্মাণের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পর্ক শুধুমাত্র প্রশাসনিক। অর্থনৈতিক কোনও সম্পর্ক নেই। নাগরিকদের ট্যাক্সের টাকায় রামমন্দির তৈরি করা হচ্ছে না। মন্দির নির্মাণে প্রস্তাবিত খরচ ৩০০ কোটি টাকা। কিন্তু মন্দির কমপ্লেক্স তৈরি করতে আরও ১২০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। প্রশ্ন হলো এই বিপুল পরিমাণ অর্থ আসবে কোথা থেকে? মন্দির নির্মাণের দায়িত্ব রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের। ট্রাস্টের উদ্যোগেই সারা দেশে ২৫ নভেম্বর থেকে ২৫ ডিসেম্বর অর্থ সংগ্রহ অভিযান চলবে। অর্থাৎ মন্দির তৈরি হবে মানুষের দানে। বিভিন্ন এনজিও এবং এনআরআই-দের কাছে বড়ো অনুদান আশা করছে ট্রাস্ট। আর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে? না, সহযোগিতা ছাড়া কেন্দ্রের কাছে ট্রাস্টের আর কোনও প্রত্যাশা নেই।

রামমন্দির নির্মাণ উপলক্ষ্যে সারা দেশে এখন সাজো সাজো রব। যাঁরা ভারতবর্ষের সত্যি ইতিহাস জানেন তাঁরা এই জাতীয় আনন্দের অংশীদার। কিন্তু যাঁরা জানেন না বা যাঁদের হাতেই যুগ যুগ ধরে বিকৃত হয়েছে ভারতের ইতিহাস তাঁদের কাছে ভারতীয় জাতিসত্তার পুনরুত্থানের এই প্রয়াস খুব শুভ সংকেত নয়। রামমন্দির নির্মাণের পর বদলে যাবে ভারতের রাজনীতি। সেই বদলে যাওয়া রাজনীতিতে তাঁদের টিকে থাকা শুধু কষ্টকরই নয়, প্রায় অসম্ভব। কারণ দেশবিরোধিতা না থাকলে তাঁদের রাজনীতি শূন্যগর্ভ হয়ে উঠতে বাধ্য।

কংগ্রেস এবং বামপন্থী রাজনীতির ঘোর দুর্দিন বোধহয় আসন্ন।

শিলান্যাস অনুষ্ঠানের মঞ্চে রামমন্দির নির্মাণ ট্রাস্টের অধ্যক্ষ মহন্ত নিত্যগোপাল দাসকে নমস্কার করছেন শ্রীমোদী।

‘রামমন্দির পুনর্নির্মাণের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই’

সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন রামজন্মভূমি-তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক তথা বিশ্ব বিন্দু পরিষদের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি চম্পত রাই। ব্যস্ত সফরসূচি, সাংবাদিক সম্মেলন তার মধ্যেও আলাদা করে সময় দিলেন স্বস্তিকার জন্য। স্বস্তিকার সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় তিনি কয়েকটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করলেন।

□ আপনাকে স্বস্তিকায় স্বাগত। রামজন্মভূমি নির্মাণ-ক্ষেত্রের পরিস্থিতিটা বর্তমানে ঠিক কীরকম, তা জানার আগ্রহ ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের রয়েছে। কাজ কতদূর এগোল, সে সম্পর্কে বলুন। বিশেষ করে করোনাকালে কাজের পরিস্থিতি যে ছিল না তা আমাদের জানা। তবুও আমরা আপনাদের অভিনন্দন জানাই যে দেশের প্রধানমন্ত্রী সঠিক সময় মন্দিরের ভূমি-পূজনে অংশ নিতে পেরেছেন।

● আপনারা জানেন, রামজন্মভূমি নির্মাণের প্রক্রিয়া গত বছরের মার্চ থেকে শুরু হয়েছে। ভগবান রামচন্দ্র যে কাপড়ের তাঁবুতে অধিষ্ঠিত ছিলেন, মন্দির ওখানেই নির্মাণ হচ্ছে। এইজন্য নির্মাণ-পর্বের প্রথম ধাপে ছিল তাঁকে অন্য কোনও সুরক্ষিত স্থানে অধিষ্ঠিত করা, যেখানে দর্শনার্থীদের যাতায়াত সুগম হয়, যাতে তাঁরা পূজার্চনাও করতে পারেন, আবার অন্যদিকে মন্দিরের নির্মাণ কাজও হয়। গত মার্চের মধ্যে, করোনা-পরিস্থিতির আগেই এই ব্যবস্থা সম্পন্ন করে ফেলা হয়েছিল। এরপর ওই জায়গাটা পরিষ্কার করার একটা ব্যাপার ছিল। এতদিন ব্যারিকেডের জন্য লোহা, স্তম্ভ, বাঁশ, নজরদারির জন্য থাকা সিসি টিভি ক্যামেরা, তাছাড়া বিজলি বাতি-স্তম্ভ এই সবকিছু সরিয়ে আমরা মে মাস নাগাদ জায়গাটা মন্দির নির্মাণের উপযুক্ত করার মতো পরিষ্কার করে দিই। আপনারা জানেন, ওই সময় দেশে করোনা মহামারীর দরুন কিছু সরকারি বিধিনিষেধ ছিল। সেই কারণে কাজের কিছু দেরি হয়। এই প্রাথমিক কাজের পরে পনেরো জুলাই নাগাদ লারসেন অ্যান্ড টুব্রো নির্মাণ-সংস্থার হাতে মূল নির্মাণকার্যের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এরপর প্রধানমন্ত্রী আসেন আগস্টে। তিনি আসায় নির্মাণ প্রক্রিয়া দ্রুতগতিতে এগোয়। আগস্ট শেষ হতে না হতেই লারসেন অ্যান্ড টুব্রোও জোর কদমে কাজে নেমে পড়ে। ২০০ ফুট গভীর পর্যন্ত মৃত্তিকা পরীক্ষা হয়, ভূমিকম্পের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও হয়। বিভিন্ন আইআইটি যেমন চেন্নাই, মুম্বই, গৌহাটি, দিল্লি, এছাড়া এনআইআইটি, টাটা, লারসেন অ্যান্ড টুব্রোর ইঞ্জিনিয়াররা তো ছিলেনই; তাঁরা বারবার আলাপ-আলোচনায় বসেন। কারণ সরযূ নদীর কিনারায় এই নির্মাণ কাজ যথেষ্টই কঠিন। এখানকার জমি কেবল আলগা, মিহি বালি দিয়ে তৈরি, এই জমিতে পাথর বা মাটি সেভাবে নেই, তারপরে মাটির নীচে জলও আছে। সুতরাং হাজার বছরের পুরাতন পাথর দিয়ে এখানে ভিত তৈরি করা যথেষ্টই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সুতরাং এর ভিত কীভাবে

কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলনে চম্পত রাই (মাঝখানে), তাঁর ডানদিকে রাজ্য সম্পাদক অমিয় সরকার ও বাঁদিকে অ্যাডভোকেট ফিরোজ ইদুল।

দীর্ঘস্থায়ী করা যায়, তা নিয়ে নিরন্তর গবেষণা হয়েছে। আশা করা যায়, আর এক সপ্তাহের মধ্যে প্রাথমিক সব কাজ আমরা শেষ করে, জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ভিত নির্মাণের কাজ শুরু করে দিতে পারব। সুতরাং এতদিন নির্মাণকার্যের পরিভাষায় যাকে বলে গ্রাউন্ডওয়ার্ক, হোমওয়ার্ক সেই কাজটি আমরা সম্পন্ন করে ফেলেছি, এবার রামমন্দিরের আসল নির্মাণকাজ শুরু হবে।

□ কিন্তু বিরোধীরা অভিযোগ করছেন, করোনাকালে মানুষ যেখানে ঠিকমতো খেতে পারছেন না, সেখানে রামমন্দির নির্মাণ বিলাসিতামাত্র। রামমন্দির অযোধ্যার অর্থনীতির হাল কীভাবে ফেরাবে?

● অযোধ্যার অর্থনীতি চিরদিনই দর্শনার্থী-নির্ভর। রামমন্দির নির্মাণ হলে দর্শনার্থী বাড়বে, এখানকার অর্থনীতিও সমৃদ্ধ হবে।

□ অর্থাৎ পর্যটন-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটবে আপনি বলতে চাইছেন?

● না, আমি শুধু পর্যটনের কথা বলছি না। আমি তীর্থের দিক দিয়ে বিষয়টি দেখতে চাইছি। পর্যটন আর তীর্থের পার্থক্যটা বুঝতে হবে। এখন ১০ থেকে ১২ হাজার তীর্থযাত্রী অযোধ্যায় আসছেন। এটাই এখানকার অর্থনীতি। আগামীদিনে এখানে তীর্থ করতে আসা মানুষের সংখ্যা আরও বাড়বে। রাজ্য ও কেন্দ্র উভয় সরকারের তরফ থেকেও তীর্থযাত্রীদের বিষয়টি নিয়ে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এবার দেখা যাবে রামমন্দিরকে কেন্দ্র করে এখানে কেমন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়। সরকার রেলস্টেশন, বাসটার্মিনাল প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, উত্তরপ্রদেশ সরকারও জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা নিয়েছে, সেখানে মেডিক্যাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার পরিকল্পনা আছে। দু'লেনের সমস্ত রাস্তা চার-লেনের করা হবে। ফলে অযোধ্যায় পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্যও সরকার বিস্তর খরচ করছে। তার ওপর তীর্থযাত্রী বাড়লে অযোধ্যার জনজীবন অধিক সমৃদ্ধিশালী হবে। সবমিলিয়ে অযোধ্যা তথা উত্তরপ্রদেশের অর্থনৈতিক চালচিত্রই বদলে দিতে সক্ষম হবে এই রামমন্দির।

□ একটি কৌতূহলী প্রশ্ন, রামমন্দিরের বিষয়টি আদতে সাংস্কৃতিক। কিন্তু বর্তমানে এটি রাজনৈতিক বিষয়ে পর্যবসিত হয়েছে বলে কি মনে করেন না? আপনার কাছে অযোধ্যাবাসীর এবিষয়ে কী মত জানতে চাইছি।

● শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির তৈরি বা রামলালাকে স্বস্থানে ফিরিয়ে দেবার বিষয়টি কোনোদিনও রাজনৈতিক ছিল না, আজও রাজনৈতিক নেই। এর মধ্যে কোনও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ নেই। মনে রাখবেন, ভারতীয় জনগণ পাঁচশো বছর ধরে রামলালাকে নিজের স্থান ফিরিয়ে দিতে সংগ্রাম করেছে। রাজনীতির জন্মই তো হলো সেদিন। রামমন্দির হলো রাষ্ট্রের সম্মান, রাষ্ট্রের অস্মিতা, রাষ্ট্রের গৌরব বৃদ্ধি, রাষ্ট্রের সম্মানের প্রশ্নে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কথাই আসে না। রাষ্ট্রনীতির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতে পারে।

□ আপনার কী মনে হয়, রামমন্দির নির্মাণের কোনো সদর্থক দিক ভারতবর্ষের ওপর পড়বে। যা স্বদেশ-অস্মিতা বাড়াতে সাহায্য করবে?

● প্রথমেই মনে রাখতে হবে, রাম কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলের নন। রাম ভারতবর্ষের মানুষের প্রতীক। তিনি প্রতিটি ভারতবাসীর অস্মিতার প্রতীক। তিনি রাষ্ট্রের অস্মিতার প্রতীক। এর ফলে ভাষা, জাত, বর্ণ, অঞ্চল নির্বিশেষে ভারতবাসীর মধ্যে একাত্মবোধ জাগবে। বিদেশি আক্রমণকারী দেশকে আক্রমণ করলে সেটা দেশের অপমান বলে বিবেচিত হয়। যেমন চীন লাদাখের ভূমি দখল করলে সেটা কেবল লাদাখের নয়, সমগ্র দেশের অপমান। পাকিস্তান কার্গিলের এক একটি সেনা- চৌকি দখল করেছিল, সেটা কেবল জম্মু-কাশ্মীর নয়, গোটা হিন্দুস্থানের অপমান ছিল। রাষ্ট্রের অপমান দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে, এই ভাব সার্বিকভাবে আজ জেগে উঠেছে। সুতরাং নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় বিশেষ ব্যতিরেকে রামজন্মভূমি মন্দির সারা দেশকে আজ ঐক্যবদ্ধ করেছে, ভবিষ্যতেও করবে।

আঞ্চলিকতার ঊর্ধ্বে উঠে নিজের দেশকে মা ভাবার শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করবে এই রামমন্দির। অবসান ঘটবে বিচ্ছিন্নতার, এটাই হবে দেশের মানুষের জন্য রামজন্মভূমির দান।

□ একটা প্রশ্ন এখানে স্বাভাবিকভাবেই স্বস্তিকার পাঠকদের তরফ থেকে থাকবে যে এতে অযোধ্যায় মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া ঠিক কীরকম।

● অযোধ্যার মুসলমানরা কোনোদিনও রামমন্দিরের বিপক্ষে যাননি। তারা কোনোদিন এবিষয়ে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেননি। তাঁরা সবাই খুশি। অযোধ্যার ভিতরে হিন্দু-মুসলমান কেমন সম্পর্ক তা না দেখলে শুধু মুখে বলে বোঝানো মুশকিল। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এসে স্বচক্ষে দেখে যান। তাহলেই বুঝতে পারবেন অযোধ্যায় হিন্দু-মুসলমানের সংযোগ কতটা সুদৃঢ়।

□ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আপনার আমন্ত্রণ-বার্তা তাঁদের কাছে আমরা পৌঁছে দেব। এই কারণেই প্রশ্ন, যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে অনেক মিথ্যাই রটানো হয় রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য। সঠিক সত্যটা তুলে ধরার জন্য আবার ধন্যবাদ। রামমন্দির নির্মাণে রাজ্য-কেন্দ্র উভয় সরকারের সহযোগিতা কতটা পাচ্ছেন?

● দেখুন সহযোগিতা দু'প্রকারের হতে পারে। প্রথমত, আর্থিক সহযোগিতা। আমরা ঠিক করেছি সরকারের কাছ থেকে কোনওপ্রকার আর্থিক সহযোগিতা নেব না। কিন্তু দেশের এই অস্মিতার স্মারক-স্তম্ভ নির্মাণে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় উভয় সরকারকেই আমরা শরিক করতে চাইছি। উভয় সরকারের উদ্যোগে পরিকাঠামোর উন্নয়নের কথা আগেই আপনাকে বলেছি। সরকারের সহযোগিতা এই পর্যন্তই। দুটো সরকারকেই আমরা দেশের অস্মিতার ক্ষেত্রে মেলাতে পেরেছি, এটুকুই প্রত্যাশা ছিল।

□ উত্তরপ্রদেশের রাজনৈতিক দলগুলির এনিয়ে মনোভাব কেমন?

● উত্তরপ্রদেশের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিরোধ আছে, তবে তা রাজনীতির কারণে। রামমন্দিরের প্রশ্নে এখন কোনও বিরোধ নেই।

□ আপনার কথায় এটা পরিষ্কার রামমন্দির নির্মাণের কাজের অগ্রগতি এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট সন্তোষজনক। আগামীদিনে আরও দ্রুত ও ভালো কাজ হোক, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এটুকুই শুধু চান। পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে পুরো বিষয়টি অবগত করানোর জন্য ধন্যবাদ আপনার অবশ্যই প্রাপ্য।

● আপনাদেরও ধন্যবাদ। পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে অযোধ্যায় রামমন্দির দর্শনের আগাম আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলাম। □

With Best Compliments from :-

ORBIT GROUP

লোকান্তরিত হলেন প্রবীণ প্রচারক গজানন দিনকর বাপট

সামান্য রোগভোগের পর গত ২৫ ডিসেম্বর লোকান্তরিত হলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক গজানন দিনকর বাপট। বঙ্গবাসী স্বয়ংসেবকদের কাছে তিনি 'গজাননদা' নামেই সুপরিচিত ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। ১৯৬৫ সালে তিনি প্রচারক হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে আসেন। দার্জিলিং জেলা প্রচারক, জলপাইগুড়ি বিভাগ জেলা প্রচারক, হাওড়া বিভাগ প্রচারক ও নবদ্বীপ বিভাগ প্রচারকের দায়িত্ব পালন করার পর বর্ধমান সম্ভাগ প্রচারকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৭ সালে পূর্বাঞ্চল বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের সহপ্রান্ত সংগঠন সম্পাদক, ১৯৯৮ সালে বিহার ও ওড়িশা ক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক, ২০০০ সালে উত্তর-পূর্ব ক্ষেত্র, অখিল ভারতীয় সহ-ব্যবস্থা প্রমুখ এবং ২০১৩ সাল থেকে অখিল ভারতীয় ব্যবস্থা প্রমুখের দায়িত্ব পালন করেন। তারপর অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর আমন্ত্রিত সদস্য ও অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার সদস্য ছিলেন। গত কয়েক বছর থেকে দায়িত্ব মুক্ত থেকে প্রবীণ প্রচারক হিসেবে কল্যাণ ভবনেই থাকতেন।

।। সংযোজন।। মৃত্যুর কয়েকমাস আগে গজাননদা যে কাজটি করে গিয়েছেন তা স্বয়ংসেবকদের কাছে একটি বিশেষ প্রাপ্তি। বাংলার প্রয়াত প্রান্ত প্রচারক বসন্তরাও ভট্ট-র জীবন নিয়ে বিভিন্নজনের লেখা একটি জীবনী সংকলন 'সবার আপনজন' গ্রন্থটি তিনি সম্পাদনা করে গিয়েছেন।

প্রত্যক্ষ সঙ্ঘকাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার সময় বিভিন্ন সঙ্ঘশিক্ষাবর্গে তিনি মুখ্যশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

সঙ্ঘস্থানে তিনি ঢিলেঢালা ভাব একেবারেই পছন্দ করতেন না। বন্ধুস্থানীয়রা গজাননদার দাপট নিয়ে মজা করতেন। ১৯৯২ সালে কল্যাণীতে যে বিশাল শিবির হয়েছিল তার প্রস্তুতির প্রধান দায়িত্ব বস্তুত তাঁরই ওপর ছিল। আশির দশকে মুম্বাইতে কল্যাণ আশ্রমের উদ্যোগে সর্বভারতীয় 'একলব্য খেলকুদ' প্রতিযোগিতা হয়েছিল। বাংলার প্রতিযোগীদের নিয়ে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। আপাত কঠোর মানুষটির মধ্যে যে একটি বিশাল হৃদয় ছিল, যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরাই তা অনুভব করেছেন। এমন একজন কর্মযোগীকে হারিয়ে আমরা সবাই শোকাহত।

রাম জন্মভূমি মন্দির হোক বিশ্বের বিস্ময়

ডাঃ শচীন্দ্রনাথ সিংহ

হাজার বছরের পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার দিনে ভারতবাসী যেমন আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকট করেছিল, ঠিক তেমনি ৫ আগস্ট ২০২০ অযোধ্যায় রামমন্দিরের ভূমিপূজন ও মন্দির নির্মাণের শুভ সূচনার সময় সেরূপ আনন্দ ও আবেগপূর্ণ মুহূর্ত ছিল। সেদিন ৫০০ বছরের বিবাদের অবসান হয়। রামজন্মভূমি আন্দোলন ছিল দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম। স্বাধীনতা সংগ্রামের মন্ত্র ছিল 'বন্দে মাতরম্', রামজন্মভূমি আন্দোলনের মন্ত্র হলো 'জয়-শ্রীরাম'। রামজন্মভূমি মুক্ত করার জন্য ১৫২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে হিন্দু সমাজ ক্রমাগত সংঘর্ষ করে এসেছে। ৭৬ বার সংঘর্ষ হয়েছে। স্বাধীন ভারতে রামজন্মভূমি মুক্ত করার জন্য যেমন বিভিন্ন সময় জনজাগরণ হয়েছে তেমনি আইনি লড়াইও চলেছে ১৯৫০ সাল থেকে। দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার অবসান হয় ২০১৯-এর ৯ নভেম্বর। সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ বিবাদিত ভূমি 'শ্রীরাম জন্মস্থান' বলে ঘোষণা করেন। ভারত সরকার সরকারি অধিগৃহীত ৬৭ একর জমি এবং শ্রীরাম জন্মস্থান অর্থাৎ মোট ৭০ একর জমি 'শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র' ট্রাস্টের হাতে সমর্পণ করে। এই ৭০ একর ভূমিতেই মন্দির ও মন্দির পরিসর নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়েছে। সব বাধা দূর হয়েছে। সর্বশক্তি লাগিয়ে তাড়াতাড়ি মন্দির নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করতে হবে। ভগবান রামলালা আর কতকাল অস্থায়ী মন্দিরে থাকবেন?

সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্ম সর্বজ্ঞ ভগবান শঙ্কর যাঁর বন্দনা করেছেন, যিনি স্বয়ং কল্পবৃক্ষ স্বরূপ, মর্যাদা পুরুষোত্তম, যিনি দেশ, কাল, সময়ের ঊর্ধ্বে, সব কিছুর প্রেরণাকেন্দ্র, যাঁকে সমাপ্ত করার সব প্রকার চেষ্টা করা হয়েছে, যিনি সমস্ত ভারতবাসীর হৃদয় দেবতা, ভারতীয় শাশ্বত আস্থার প্রতীক, তিনিই ভগবান শ্রীরামচন্দ্র। কোটি কোটি ভারতবাসী এবং বিশ্বের সমস্ত রামভক্তদের আস্থা-শ্রদ্ধা এবং প্রেরণা জোগাবে অযোধ্যস্থিত ভগবান শ্রীরামের ভব্য মন্দির। রামমন্দির পরিসরে নির্মাণ হবে সংগ্রহশালা, যজ্ঞশালা, ধর্মশালা, বেদপাঠশালা, গ্রন্থাগার, সৎসঙ্গ ভবন, সভাস্থল, প্রসাদ বিতরণ কেন্দ্র, অতিথি নিবাস, সন্ত নিবাস, প্রদর্শনী, পার্কিং ও প্রসাধন। সব মিলিয়ে অযোধ্যার পবিত্রতা, পুণ্যতা, ভব্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুরো নগরের অর্থব্যবস্থার কায়াকল্প পরিবর্তনের কল্পনা রয়েছে। অযোধ্যায় গেলে রামলালার দর্শন করে মনে আনন্দ ও হৃদয়ে সংকল্প

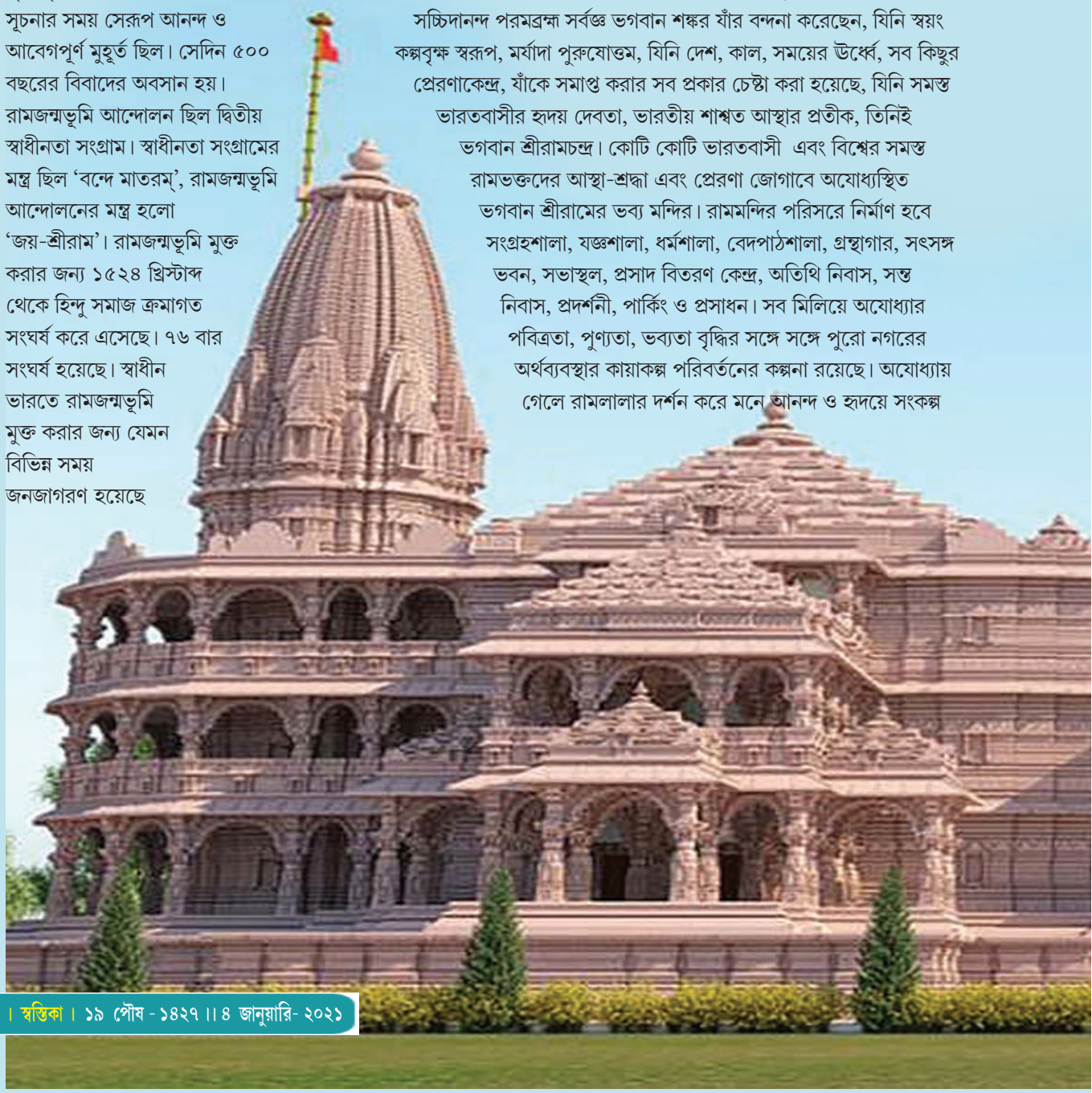

নিয়ে ফিরতে পারতেন রামভক্তরা।

গত ১১ নভেম্বর ২০২০ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব হিন্দু পরিষদের 'কেন্দ্রীয় মার্গদর্শক মণ্ডল' এর সাধু-সন্তরা শ্রীরাম জন্মভূমি মন্দির পুনর্নির্মাণের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পূজ্য সন্তগণ ঘোষণা করেছেন, রামমন্দির নির্মাণের জন্য দেশের ৪ লক্ষ গ্রামে ১১ কোটি পরিবারের ৫০ কোটি মানুষকে আগামী ১৫ জানুয়ারি ২০২১ থেকে ২৭ ফ্রেব্রুয়ারি এই কালখণ্ডে সম্পর্ক স্থাপন করে শ্রীরামমন্দিরের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য ধনসমর্পণ অভিযান করা হবে। পূজ্য সন্তগণ ভারতীয় প্রাচীন পরম্পরা অনুসারে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির নির্মাণের জন্য সমগ্র সমাজের কাছে সাত্ত্বিক দান চেয়ে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁরা আরও বলেন, 'শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র' এই নামে ধনসংগ্রহ হবে। সমস্ত রামভক্তরা সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালির মতো এই পুণ্য যজ্ঞে যথাসাধ্য সহযোগিতা করে পুণ্যের ভাগীদার হোন।

রামমন্দির কেবল একটি মন্দির নয়। রামমন্দির নির্মাণ ব্যক্তিকে সমাজের সঙ্গে যুক্ত করার, পরিবারকে রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করার, নরকে নারায়ণের সঙ্গে যুক্ত করার, বর্তমানকে অতীতের সঙ্গে যুক্ত করার, নিজেকে সংস্কারিত করার কাজ— এ এক প্রকার রাষ্ট্র নির্মাণের কাজ। এই কাজে সমাজের সব স্তরের, সব শ্রেণীর মানুষের কাছে যেতে হবে। যেভাবে ভগবান শ্রীরাম কাঠবিড়ালি থেকে বানর, কেওট থেকে জনজাতি— বনবাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট'-এর সাধারণ সম্পাদক ও বিশ্ব বিন্দু পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রী চম্পত রাই গত ২১ ডিসেম্বর ২০২০ কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, মন্দির নির্মাণের কাজ দ্রুততার সঙ্গে চলছে। 'লারসেন অ্যান্ড টুব্রো' এবং 'টাটা' এই দুই সংস্থা মন্দির নির্মাণের কাজ করছেন। পুরো মন্দিরটি পাথরের হবে। ভূতল-১মতল-দ্বিতল, প্রতিটি তলার উচ্চতা ২০ ফুট করে হবে। মন্দিরের ক্ষেত্রফল ২.৭ একর। দৈর্ঘ্য ৩৬০ ফুট, প্রস্থ ২৩৫ ফুট, উচ্চতা (শিখর পর্যন্ত) ১৬১ ফুট, মোট মণ্ডপ থাকবে ৫টি। তিনি বলেন, সমগ্র দেশবাসী শ্রীরামের জন্মস্থানে এই বৃহৎ সুশোভিত মন্দির দেখার আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে। ট্রাস্টের পক্ষ থেকে ১০, ১০০ এবং ১০০০ টাকার কুপন ও রসিদের মাধ্যমে অর্থসংগ্রহ হবে। এই ভাবে ভগবান শ্রীরাম মন্দিরের ছবি লক্ষ লক্ষ মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাবে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন রামমন্দির নির্মাণ কাজে কোনো সরকারি অনুদান নেওয়া হবে না।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, এর আগে অনেক অভিযান যেমন স্বামী বিবেকানন্দ শিলাস্মারক (কন্যাকুমারীতে স্বামী বিবেকানন্দের স্মারক নির্মাণ), সংস্কৃতি রক্ষা যোজনা, রামশিলা পূজন ইত্যাদি সফলতার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সন্তদের আশীর্বাদে ভগবানের এই কাজে অর্থ কখনও বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। শুধু অর্থ নয় রামভক্তদের যথাসম্ভব উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে এই কাজে সময় দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন রামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রের ট্রাস্টিরা। রামজন্মভূমিতে ভগবান শ্রীরামের মন্দির নির্মাণ করার জন্য যারা জীবন বলিদান দিয়েছেন তাদের প্রেরণাই আমাদের পাথেয় হোক। তাদের ত্যাগ অনন্তকাল হিন্দু সমাজকে প্রেরণা দেবে।

বর্তমানে দেশ এক বিশেষ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলছে। এই সময় প্রভু শ্রীরামের কর্তব্যপরায়ণতার শিক্ষা নিয়ে স্থান, কাল, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে, রাম বিরোধী শক্তিকে উপেক্ষা করে, লক্ষ্যে অবিচল থেকে পরস্পরের মেলবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এই কর্মযজ্ঞে সফলকে এক হতে হবে। জাতি, ধর্ম, ক্ষেত্র, ভাষা, মত, পথ, পন্থ নির্বিশেষে সফল মানুষের পূর্ণ সহযোগিতায় ভগবান শ্রীরামের মন্দির সঠিক অর্থে একটি জাতীয় মন্দির হিসাবে পরিণত হবে। রামমন্দির আপামর রামভক্তদের মন্দির। আপনার আমার সকলের মন্দিরে। ভগবান শ্রীরাম সকলের। কোনো ব্যক্তি বিশেষের অর্থানুকূল্যে নয়, সবার পরশে, সকলের সমর্পিত অর্থে অযোধ্যায় শ্রীরামমন্দির হয়ে উঠুক বিশ্বের বিস্ময়। ■

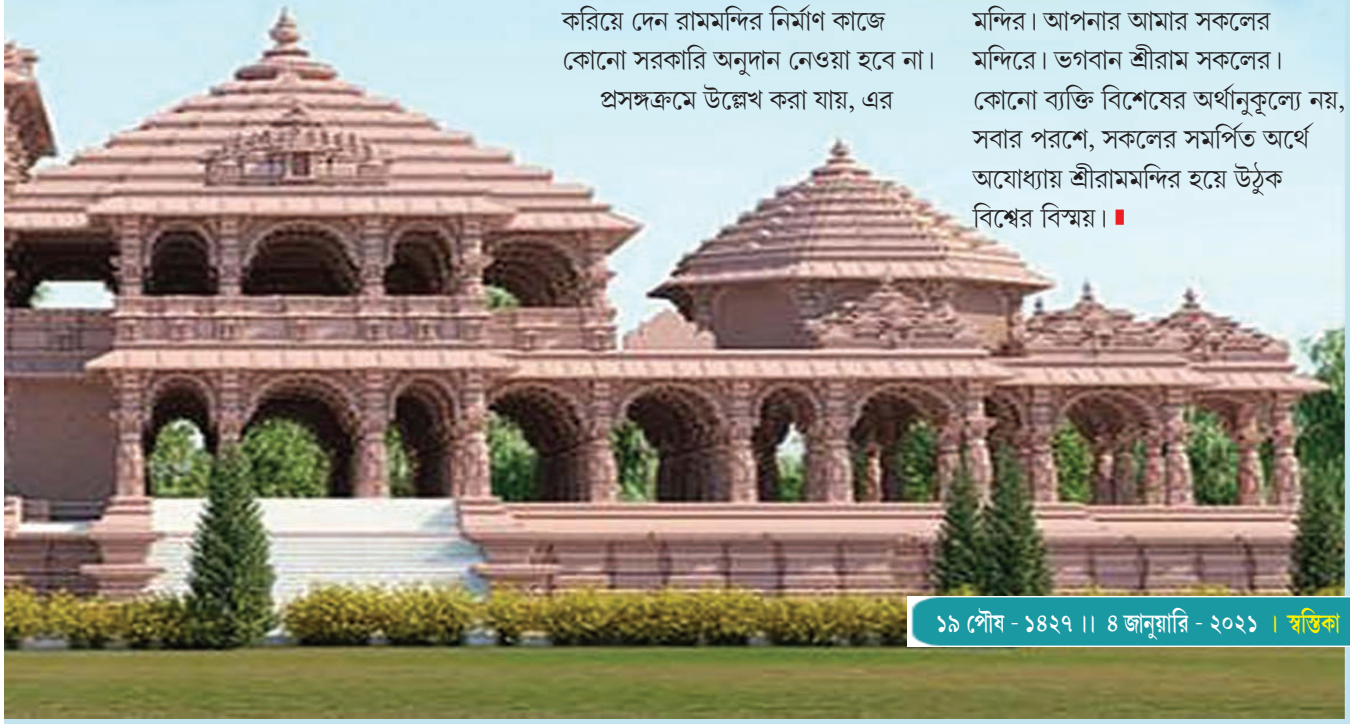

ইতিহাসবোধের জাগরণে রামমন্দির পুনর্নির্মাণ শক্তিশালী পদক্ষেপ

অনিমেষ বাগচী

একটি জাতির গর্ববোধের উৎস হলো তার ইতিহাসবোধ। অতীতের ঘটনা পরম্পরা ইতিহাস হতে পারে কিন্তু কয়েকটি ঘটনার লিখিত বিবরণ পড়ে ইতিহাসবোধের উৎসার হয় না। অতীতের ঘটনা পরম্পরার নির্যাস যা একটি জাতির মানুষ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অন্তরে ধারণ করে থাকে, তাকেই ইতিহাসবোধ বলা যেতে পারে। ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য, এ দেশের মানুষের ইতিহাসবোধ বহু যুগ আগেই অবলুপ্ত হয়েছে অথবা বলা ভালো, ধ্বংস করা হয়েছে। যার ফলে প্রথমে মুসলমান, পরে ব্রিটিশ এবং স্বাধীনতার পর সরকার-পোষিত বামপন্থী ঐতিহাসিকেরা ভারতের অতীতের ঘটনা পরম্পরাকে বিকৃত করতে পেরেছেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে, ভারতের মানুষের চেতনায় ইতিহাসবোধের সঞ্চার ঘটাতে অযোধ্যায় রামমন্দিরের পুনর্নির্মাণ একটি শক্তিশালী পদক্ষেপ।

প্রশ্ন উঠতে পারে অযোধ্যায় রামমন্দির পুনর্নির্মাণের সঙ্গে এ দেশের মানুষের ইতিহাসবোধের কী সম্পর্ক? রাম ভারতের ঘরে ঘরে দেবতা হিসেবে পূজিত হন। অযোধ্যায় যে মন্দির তৈরি হচ্ছে তাও একজন দেবতারই মন্দির। দেবতা মানুষের কল্পনা কিন্তু ইতিহাস কঠোর বাস্তব। সুতরাং এই দুইয়ের মধ্যে কোনও সম্পর্কই থাকতে পারে না।

এতকাল ভারতবর্ষের আপামর বামপন্থী জনসাধারণ এই প্রশ্নগুলোই তুলে এসেছেন। কোনও জাতির ইতিহাসবোধ ধ্বংস করতে চাইলে তার জাতীয় নায়ককে প্রচ্ছন্ন করে রাখা সব থেকে জরুরি। সব থেকে কাজেরও বটে। তাই, রাম বাল্মীকির কল্পনা, তার কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই— এইসব তত্ত্ব এক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী। ইসলামি আমলে, কিংবা ব্রিটিশ আমলে— এমনকী স্বাধীনতার পরে কংগ্রেসি আমলেও এইসব কথা বারংবার শুনতে শুনতে কোনও হিন্দু যদি মনে করেন যে রাম যদি বাল্মীকির কল্পনাই হন তাহলে কী লাভ তাকে নিয়ে গর্ব করে! —বোধহয় তাকে দোষ দেওয়া যায় না। দশচক্রে ভগবান যেমন ভূত হন, দশমুখের এক কথায় সত্যিও মিথ্যে হয়ে যায়। তবে যা সত্য, মিথ্যে হয়ে তা বেশিদিন থাকে না। একদিন তার প্রকাশ হয়েই যায়। বামপন্থীরা যতই নিজেদের জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান ভাবুন, ধর্মের কল যখন বাতাসে নড়তে শুরু করে তখন অধর্মের কোনও বিদ্যেই কাজে লাগে না। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হতে গিয়ে বামপন্থীরা কয়েকটি গোড়ার কথা হিসেবের মধ্যে ধরেননি, (১) একজন কবি, সে তিনি যতই যুগন্ধর হোন, তাঁর সৃষ্ট কোনও চরিত্রের পক্ষে কি দশ হাজার বছর ধরে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাপনের অঙ্গ হিসেবে থেকে যাওয়া সম্ভব? যদি সম্ভব হয় তাহলে ধরে নিতে হয় বাল্মীকির মতো কবি সারা পৃথিবীতে কেউ কখনও জন্মাননি। ভবিষ্যতেও কেউ জন্মাবেন না। কারণ রবীন্দ্রনাথ হোন বা শেক্সপিয়ার— কারোর কোনও চরিত্র এমন সুদীর্ঘ অমরত্ব লাভ করেনি। সুতরাং একথা মেনে নিতে কোনও দ্বিধা থাকা উচিত নয় যে রামায়ণ সত্য বলেই রাম অমর, (২) রাম যদি বাল্মীকির কাল্পনিক চরিত্রই হবেন তাহলে গ্রিক পর্যটক মেগাস্থিনিস ভারতের প্রাচীন সম্রাটদের যে তালিকা তৈরি করেছিলেন তাতে রাম, কৃষ্ণ, দশরথ, রাবণ, যুধিষ্ঠিরের নাম রাখলেন কী করে? (সূত্র : ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান, ড. অসিত সমাদ্দার)। কাশ্মীরি পণ্ডিত কলহনই বা কী করে তার রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে নন্দবংশের রাজা মহাপদ্মনন্দের রাজত্বের

রামমন্দিরের জন্য ৬১৩ কেজি ওজনের ঘণ্টা প্রস্তুত।

কালপর্ব নির্ধারণ করতে গিয়ে সম্রাট যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালের কত পরে তিনি রাজা হয়েছিলেন তার উল্লেখ করলেন? ব্রিটিশরা যার ইতিহাসকে ভারতের যথার্থ ইতিহাস বলে সার্টিফিকেট দিয়েছে, সেই কলহন তো গ্রন্থের শুরুতেই যুধিষ্ঠিরের অস্তিত্ব মেনে নিলেন! যুধিষ্ঠিরকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসেবে মেনে নেওয়ার অর্থ মহাভারতকে ইতিহাস হিসেবে মেনে নেওয়া। এবং সেইসঙ্গে রামায়ণকেও। কারণ মহাভারতের ছত্রে ছত্রে রয়েছে রামায়ণের প্রসঙ্গ। এমনকী, এ কথাও রয়েছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে হনুমান অর্জুনকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছিলেন।

একটা কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, রাম ভারতবর্ষের জাতীয় নায়ক। রামই প্রথম ব্যক্তি যিনি সারা ভারতবর্ষকে এক ছাতার নীচে আনতে পেরেছিলেন। রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যে সেনাদল তিনি গঠন করেছিলেন তাতে বানর, দস্যু, পক্ষী চোর সম্প্রদায়-সহ ভারতের সব গোষ্ঠীর মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল। রাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন ভারতের সর্বাধিনায়কের ভূমিকায়। লঙ্কার যুদ্ধের পর রামের সুশাসন এবং জীবনসত্যের প্রতি অবিচল আস্থা তাকে দেবতার আসনে সমাসীন করে তোলে। এখনকার বামপন্থীদের মতো বাবরও তাই ভেবেছিলেন রামকে ধ্বংস করতে পারলেই এদেশের হিন্দুদের শেকড় ধরে টানা যাবে। বাবর জানতেন, শাসক যত শক্তিধরই হোক এত বড়ো দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমাজের সবাইকে হত্যা করাও সম্ভব নয়, ধর্মান্তরিত করাও সম্ভব নয়। এমনকী হাজার হাজার মঠ মন্দির বিহার ভেঙে ফেলাও সম্ভব নয়। বরং তুলনায় অনেক সহজ হিন্দুদের নিজেদের ইতিহাসের প্রতি, অতীতের প্রতি গর্ববোধ ধ্বংস করে ফেলা। এই কারণেই অযোধ্যায় রামমন্দির ধ্বংস করতে বাবর তার সেনাপতি মির বাকি খাঁকে পাঠিয়েছিলেন। পরে বাবর ওই জায়গায় নিজের নামে ধাঁচাও তৈরি করান। এই ঘটনা সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসবাদের সর্বোত্তম উদাহরণ। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। বাবরের রামমন্দির ধ্বংস করার কয়েকশো বছর পরে বামপন্থীদের আচরণেও সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসবাদের ছায়া দেখতে পাই। নেতাজীকে তোজোর কুকুর, শ্রীরামকৃষ্ণকে মৃগী রোগী, স্বামী বিবেকানন্দকে বখাটে ছেলে বলার মধ্যে দেশের মানুষের গর্ববোধে আঘাত করার প্রবণতাই বিদ্যমান। অন্তত হিন্দুদের শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রক্রিয়ায় বাবরের সঙ্গে বামপন্থীদের কোনও পার্থক্য নেই। এখানে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠবে। বাবরই কি ভারতে সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসবাদের প্রথম প্রবক্তা? একেবারেই না। ভারতে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা হবার পর থেকেই সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসবাদ শুরু হয়েছিল। অষ্টম শতাব্দীতে মুলতানের (এখন পাকিস্তানে) সূর্যমন্দির ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসবাদের সূচনা হয়। এরপর হাজার হাজার হিন্দু ও জৈন মন্দির, বৌদ্ধ বিহার এবং শিখ গুরুদ্বার ধ্বংস করেছে ইসলামি শাসকেরা। তবে তাদের ধ্বংসকীর্তির মধ্যে সব থেকে ভয়ংকর অযোধ্যার রামমন্দির, বারাণসীর বিশ্বনাথ মন্দির এবং মথুরার কেশবদেবজীর মন্দির। ইতিহাসবিদ সীতারাম গোয়েল তাঁর 'হিন্দু টেম্পলস : হোয়াট হ্যাপেন্ড টু দেম' গ্রন্থে এরকম অনেক ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। অন্তত দশটি বিশ্ববিদ্যালয় পুড়িয়ে দিয়েছিল বিদেশি মুসলমান শাসকেরা। কয়েকশো কোটি মানুষকে হত্যা করা হয়। আমেরিকার ইতিহাসবিদ উইল ডুরান্ট যথার্থই বলেছেন, ভারতে তুর্কি অভিযান সম্ভবত বিশ্ব ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা রক্তাক্ত অধ্যায়।

রামমন্দিরের জন্য পিলার বসানোর কাজ শুরু হয়েছে অযোধ্যায়।

তবে ভারতে প্রচুর মন্দির ধ্বংস হয়েছে, এটা বোধহয় আজ আর বড়ো কথা নয়। এত কিছুর পরেও ভারতবর্ষ যে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সেটাই বড়ো কথা। আব্রাহামিক (জডাইজম, ক্রিশ্চানিটি, ইসলাম) আধিপত্যবাদের খোলা তলোয়ারের নীচে বিশ্বের সব সংস্কৃতি যেখানে কচুকাটা হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সেখানে হিন্দুদের (বহুত্ববাদী পাগান সংস্কৃতির শেষ নিদর্শন) টিকে থাকা এক কখনও-শেষ-না-হওয়া জীবনের গল্প বলে। অযোধ্যায় রামমন্দিরের পুনর্নির্মাণ নিঃসন্দেহে সেই জীবনকে আরও মহিমান্বিত করবে। ভারতবর্ষের জাতীয় নায়ক বনবাস পর্ব শেষ করে ঘরে ফিরবেন, এর থেকে আনন্দের আর কী হতে পারে! তবে এই প্রত্যাবর্তন আম ভারতবাসীর চেতনায় ইতিহাসবোধের সঞ্চার করবে, এমনটাই আশা করব। দেশকে নিয়ে গর্ব করার শক্তি অর্জন করলে বিশ্বাসঘাতকেরা যতই মাথা তুলুক এ দেশ ভাঙতে পারবে না।■

সেবাকাজ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পরম্পরা

ভারতবাসী সবাইকে সুখী দেখতে চায়। সকলের শান্তি চায়। তাই সেবার মধ্য দিয়ে তা করবার চেষ্টা করে। আর এই সেবার পরম্পরাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। এটাই সঙ্ঘের পরম্পরা। এই পরম্পরাকেই স্বয়ংসেবকরা বহন করে চলেছেন।

বিনয় বর্মন

ভারতীর জীবনের ধর্ম হলো সেবা। ভারতবর্ষ প্রাচীনকাল থেকে এই ধর্ম পালন করে আসছে। এই দেশ বহু ধ্বংসলীলা দেখেছে। দেশের বুকে বারেবারে নেমে এসেছে বন্যা, খরা, মহামারী। ভেঙে গেছে বুকের পাজর আর পিঠের মেরুদণ্ড। তবু এই দেশ প্রতিবার নিজের পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। আর এই উঠে দাঁড়ানোর মূলে রয়েছে সেবা। এখানে কেউ কারও দুঃখ সহ্য করে না। এখানে একজনের বিপদে আর একজন এসে পাশে দাঁড়ায়। বিপদের সময় সকলে একসঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে চলতে পছন্দ করে। আত্মব্রহ্ম ভাব ভারতবাসীর সকলের মধ্যে বিরাজ করে। রবীন্দ্রনাথ আত্মব্রহ্ম বলেছেন— 'সর্বজনীন সর্বকালীন মানব।' তিনি সবার মধ্যেই বিরাজমান। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সেই মানব হয়েই মানুষের সেবা করে চলেছে। রাষ্ট্রের সেবা করার জন্য যে সংগঠনের জন্ম, সেই কাজ করে চলেছে সঙ্ঘ। ভারতের বুকে যতবারই কোনো বিপর্যয় নেমে এসেছে ততবারই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তার সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মানুষের মুখে দু'মুঠো অন্ন, একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। স্বামী বিবেকানন্দের 'ভারতবাসী আমার ভাই' এই ধ্যেয় বাক্যকে কখনও ভুলে যায়নি।

তাই ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের সময় মুসলিম লিগের অত্যাচারে দুই পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তু হিন্দুদের সেবা, ত্রাণ ও পুনর্বাসনের যথাসাধ্য ব্যবস্থা করেছে সঙ্ঘ। পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে 'বাস্তুহারা সমবায় ও সমিতি'। পঞ্জাবে 'পঞ্জাব রিলিফ ফান্ড'। ১৯৬২ সালে চীনা আক্রমণের সময় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সবরকম সহযোগিতা করে দেশের সেবায় এগিয়ে আসে। স্বয়ংসেবকরা দেশের একতা ও অখণ্ডতাকে রক্ষা করার জন্য সেনাবাহিনীকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থীদের পরিত্রাতার ভূমিকা বারবার গ্রহণ করেছে সঙ্ঘ। শুধু তাই নয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়ও সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা পীড়িত মানুষের সেবা করবার জন্য সবার আগে ছুটে গেছে। নিজের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে পীড়িত আর্তের সেবা করেছে। তা ১৯৬৬ সালে বিহারের প্রচণ্ড খরা এবং দুর্ভিক্ষ হোক বা ১৯১৯ সালে ওড়িশার সুপার সাইক্লোন হোক, গুজরাটের ভূমিকম্প (২০০১) হোক বা ২০০৪ সালের সুনামি হোক, ২০০৯ সালের আয়লা, উত্তরাখণ্ডের বন্যা (২০১৩, ২০১৭), কেরলের বন্যা (২০১৮) বা উত্তরপ্রদেশ-বিহারের বন্যা (২০১৯) সর্বত্র সবার আগে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বর্তমানে করোনা মহামারী সময়েও সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা সবার আগে।

এই সেবার মানসিকতা ভারতের চরিত্রের মধ্যে রয়েছে। সেবা ভারতের পরম্পরা, ভারতের সংস্কৃতি। সঙ্ঘ সেই পরম্পরা, সেই সংস্কৃতিকে বহন করতে আগ্রণী ভূমিকা নিয়ে চলেছে। 'সেবা পরমো ধর্ম'— পূর্বপুরুষদের কাছে সকলে শুনেছে। প্রাচীন ভারতে মুনি ঋষিরা ভ্রমণ করতে করতে কোনো গৃহস্থ বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালে, কেউ তাদের ফিরিয়ে দেয় না। নর রূপে নারায়ণ জ্ঞানে তাদের সেবা করে। ভারতবর্ষের মানুষ আর্তের সেবা করাকে পুণ্য মনে করে। মানব জীবনে ঈশ্বরের পূজার একটি অঙ্গ সেবা। সে কারণে কোনো প্রতিদানের আশা না করে দীন-দুঃখীর সেবা করে। এর জন্য কোনো প্রেরণার প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় হৃদয়ের টান। যা ভারতীয়দের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে পরম্পরা অনুসারে চলে আসছে। সেবার মধ্যে থাকবে শ্রদ্ধা, কারণ এটা উপকার নয়।'

এই মানসিকতা নিয়েই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা করোনা মহামারীর মধ্যেই দেশজুড়ে সেবাকাজে নেমেছে। সঙ্ঘ অনুপ্রাণিত — সেবা ভারতী, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, আরোগ্য ভারতী, জাতীয় সেবিকা সমিতি, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈখিক মহাসঙ্ঘ প্রভৃতি সংগঠন দিনরাত সেবাকাজ করে চলেছে। বিদেশের স্বয়ংসেবকরাও সেখানে এই সেবাযজ্ঞে শামিল হয়েছেন।

বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীতে ২ মে পর্যত সর্বভারতীয় পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতবর্ষের ৮৫৭০১টি স্থানে সেবা কাজ করা হয়েছে। এতে অংশ গ্রহণ করেছে ৪৭৯৯৪৯ জন স্বয়ংসেবক। মোট এক কোটি ১০ লক্ষ ৫৫ হাজার ৪৫০টি পরিবারে রেশন সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে। রান্না করা খাদ্যের ৭ কোটি ১১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৫০০টি প্যাকেট প্রদান করা হয়েছে। ২৭ লক্ষ ৯৮ হাজার ৯১ জন পরিযায়ী শ্রমিককে বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করা হয়েছে। ৩৯,৮৫১ ইউনিট রক্তদান করা হয়েছে। ৬২ লক্ষ ৮১ হাজার ১১৭টি মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে। ১,৩১৪৪৩ জন গৃহহীনের জন্য অস্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাইরের রাজ্যের ভ্রমণ, শিক্ষা, তীর্থদর্শন করতে গিয়ে আটকে পড়া ১৩ লক্ষ ৩০ হাজার ৩৩০ জনকে বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘের সেবা কাজ চলছে সমানভাবে। সঙ্ঘের দৃষ্টিতে পশ্চিমবঙ্গ দুটি প্রান্তে বিভাজিত। দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ। আন্দামান নিকোবর নিয়ে যে দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত তাতে ১৫,৭৪০ জন স্বয়ংসেবক কঠোর পরিশ্রম করে সঙ্ঘের সেবাকাজ সর্বত্র পৌঁছানোর চেষ্টা করে চলেছে। এখনও পর্যন্ত মোট ৫৭৫০ স্থানে সেবাকাজ করা হয়েছে। ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৪৬৫টি পরিবারে রেশন সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য সেবা, শিশুখাদ্য, পাচন, হোমিওপ্যাথি ওষুধ ইত্যাদির বিশেষ ব্যবস্থা প্রদান করা হচ্ছে। মোট ৮০ জন ডাক্তার এখনও ফ্রি হেল্পলাইনের মাধ্যমে তাদের সেবা পৌঁছে দিচ্ছেন। ৫০ হাজার লোকের

কাউন্সিলিং করা হয়েছে। দু'লক্ষ মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে। ৪০০ ইউনিট রক্তদান করা হয়েছে। তাছাড়া সঙ্ঘের যে বিবিধ সংগঠন তারা মোট ৪ হাজার স্থানে ১২ হাজার কার্যকর্তা মোট ৩ লক্ষ পরিবারের সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন।

সিকিম সহ উত্তরবঙ্গের স্বয়ংসেবকরাও সমাজের সর্বত্র সেবাকাজ পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিরন্তর প্রয়াস করে চলেছেন। এখনো পর্যন্ত ৬৫৬০ জন স্বয়ংসেবক ২ হাজার ৮১১ স্থানে সঙ্ঘের সেবাসামগ্রী পৌঁছে দিয়েছেন। এর ফলে উপকৃত হয়েছে মোট ৮৬ হাজার ৯৮৮টি পরিবার। ৬১ হাজার ১৬৬টি শুকনো রেশন কিট এবং ২০ হাজার ৬০৮টি খাবারের প্যাকেট দেওয়া হয়েছে। ৩৮ হাজার ৫৯০টি মাস্ক, ১৪ হাজার ৫০৯টি সাবান ও স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে। এই কঠিন মহামারীর মধ্যেও ৬০টি রক্তদান শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন এলাকা স্যানিটাইজ করা, শিশুদের জন্য শিশুখাদ্য প্রদান, সাফাই কাজ, সাফাইকর্মীদের সংবর্ধনা দান ও অসুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে করে চলেছে

ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে সেবা কাজ করে চলেছেন সেখানকান স্বয়ংসেবকরা। টাইমস অব ইন্ডিয়া'র খবর অনুযায়ী ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ আমেরিকার ইতিহাসের অন্যতম বড়ো সেবাকাজ পরিচালনা করেছে। এই সেবাকর্মে আমেরিকার ২২৫০০ স্বয়ংসেবক অংশ গ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয়, স্বয়ংসেবক পরিচালিত সেবা ইন্টারন্যাশনাল আমেরিকা-সহ সারা বিশ্বে ৮ লক্ষ ৯০ হাজার আমেরিকান ডলার সংগ্রহ করে সেবাকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ১৫০ ইন্টারন্যাশনাল ছাত্রকে তাদের থাকা খাওয়া এবং দেশে ফেরার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ৪৬ হাজারেরও বেশি এন-৯৫ মাস্ক ও ৫০০ লিটারের বেশি স্যানিটাইজার বিলি করেছে। সারা বিশ্বে সেবা ইন্টারন্যাশনাল ও হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ যেখানেই প্রয়োজন পড়েছে, বিশ্ববাসীর সেবায় নিজেকে উজার করে দিয়ে চলেছে। ভারতবাসী সবাইকে সুখী দেখতে চায়। সকলের শান্তি চায়। তাই সেবার মধ্য দিয়ে তা করবার চেষ্টা করে। আর এই সেবার পরম্পরাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। এটাই সঙ্ঘের পরম্পরা। এই পরম্পরাকেই স্বয়ংসেবকরা বহন করে চলেছেন।

করোনা মহামারীতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সেবাকাজ

দেশের বিপদের দিনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের দেশ ও জাতির সেবায় অগ্রণী ভূমিকার কথা সর্বজনবিদিত। করোনা মহামারীর ভয়াবহ আবহে সারা দেশের স্বয়ংসেবকরা সরকারি স্বাস্থ্যবিধি পালন করে যথারীতি বিভিন্ন রকম সেবাকাজ করে চলেছেন। সিকিম, উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের ১৩ হাজার ৮৯৮ জন স্বয়ংসেবক ২০ এপ্রিল পর্যন্ত ৪ হাজার ৪৫৫ স্থানে ১

লক্ষ ৪৫ হাজার ৬৯৪ পরিবারের হাতে চাল, ডাল, আলু ও শুকনো খাবার পৌঁছে দিয়েছেন। ৪৯ হাজার ৩২৫ জনতে মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণ করেছেন।

এর সঙ্গে জনসচেতনতা মূলক অভিযান, রক্তদান, প্রতিটি জেলায় সহায়তা কেন্দ্র, চিকিৎসকের টিম গঠন, সাফাইকর্মী, পুলিশ ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করা হয়। বস্তি এলাকায় স্বয়ংসেবকরা বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেন। অন্যান্য রাজ্যে আটকে পড়া পরিযায়ী শ্রমিক ও সাধারণ মানুষদের সেই সেই রাজ্যের পক্ষ থেকে সহায়তা দানের ব্যবস্থা করা হয়।